শুকতারা

ঊনত্রিংশ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ • ১৩৮৩

সর্পরাজের ছোবলে

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সঙ্ঘামিত্রা সরকার
স্ক্যান করেছেন - সঙ্ঘামিত্রা সরকার
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্র পত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিয়ে চান বা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

বাঙ্গালা ভাষায় শ্রেষ্ঠ অভিধান বলতে

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

এতে আছে

শব্দাভিধান, চরিতাবলী, সাহিত্য পরিচয়, বিপরীতার্থক শব্দ, প্রবচন-সংগ্রহ, বাঙ্গালা ধাতু, বিবিধ জ্ঞাতব্য, একক্কাবলী, বাঙ্গালা বানানের নিয়ম, পরিভাষা, ঘটনাপঞ্জী ইত্যাদি

এক কথায় ...

বাঙ্গালা ভাষার এনসাইক্লোপিডিয়া

মূল্য ৫০.

৫০. টাকা অগ্রিম পাঠালে রেজিস্টারিযোগে বই পাঠান হবে।

দেব সাহিত্য কুটীর

২১ নং ঝামাপুকুর লেন • কলিকাতা - ৯

—মধুসূদন দেব প্রণীত—

ছাত্রসাথী
● পরিবর্তিত সংস্করণ ●
(তৃতীয় শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর)
দাম—টা. ৬·০০

আধুনিক ছাত্রসুহৃদ
প্রথম ভাগ
● পরিবর্তিত সংস্করণ ●
(চতুর্থ শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর)
দাম—টা. ৮·০০

প্রশ্নোত্তরিকা
● পরিবর্তিত সংস্করণ ●
(পঞ্চম শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর)
দাম—টা. ৮·০০

ছাত্রসুহৃদ
দ্বিতীয় ভাগ
● পরিবর্তিত নূতন সংস্করণ ●
নতুন সিলেবাস অনুসারে
(ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর)
দাম—টা. ৭·০০

দেব সাহিত্য কুটীর—২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

বাঁটুল দি গ্রেট

জ্যৈষ্ঠ

আমরা আবার এসে গেছি। রাস্তা দেখান আর এই বস্তাটা বইতে সাহায্য করুন এটা বড্ড ভারী হয়ে উঠছে!
আর কোথায় ব্যাঙ্ক আছে?
সামনে রাস্তার মোড়। চলো পথ দেখাচ্ছি! থলেটা দাও আমি নিচ্ছি!
মনে হচ্ছে এটাই! জানলার গরাদ হাতে ঠেকেছে!
ওহ্! দরজা তালা বন্ধ!
এসময় বন্ধ থাকতে পারে না। আমি একটু ঠেলা দিয়ে দেখি!
ধন্যবাদ অচেনা দাদা! বাইরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন তো?
নিশ্চয়।
মড়াৎ!
আরো বেশী গুলির শব্দ! এবার খুব কাছে মনে হচ্ছে!
দুড়ুম! দুড়ুম!
আরে, ইনসপেক্টর যে। আপনি করছেন কি? ব্যাঙ্কের মধ্যে গুলি ছুড়ছেন?
কিসের ব্যাঙ্ক? এটা জেল!
জে-জে জেল?
আবার দুই বেচারাকে ভুল জায়গায় নিয়ে এলুম!
এটা ঠিক জায়গাও হতে পারে! তোমার ঐ বস্তায় কি আছে, বাঁটুল?
একি, এযে টাকায় ভর্তি! একেবারে গাদা করা! এসব কোত্থেকে এলো?
আমি জানি! পোস্ট অফিস আর ব্যাঙ্কথেকে! এটা ভেতরে নিয়ে চলো বাঁটুল
দেখো বাঁটুল, তুমি ভুল করে কাদের জেলে ঢুকিয়েছো! পুলিশ এদের অনেকদিন ধরে খুঁজছিলো!
আরে এযে সেই মস্তান দুটো! তাহলে তো ভুল করে ঠিক জায়গাতেই ঢুকিয়েছি!
সন্ধান চাই
ব্যাঙ্ক ডাকাত
হতচ্ছাড়া বাঁটুলের খপ্পরে পড়েছিলুম রে, ইস্!

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide, No. 321 (9)-T B. C

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	সর্পরাজের দ্বীপে (সচিত্র চিত্র-কাহিনী)	—নারায়ণ দেবনাথ	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট	—নারায়ণ দেবনাথ	প্রথম ছবি
৩।	মন্দমতি মন্দাকিনী (কবিতা)	—কৌশিক মুখোপাধ্যায়	২৪৩
৪।	লাল গ্রহ মঙ্গল (জানবার কথা)		২৪৪
৫।	পাণ্ডব গোয়েন্দা (গল্প)	—ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	২৪৫
৬।	সিংহের কবল থেকে ভালুকের কোলে (শহীদ স্মৃতিকথা)	—অলক ঘোষ	২৫৯
৭।	কুতুর পালোয়ানী (মজার ছবি)		২৬৩
৮।	যুগে যুগে (ছবিতে গল্প)	—দিলীপ দাস	২৬৪
৯।	যাদুর গোপন রহস্য (যাদুবিদ্যা)	—যোগীযাদুকর মৃণাল রায়	২৬৬
১০।	অবিস্মরণীয় মণিমুক্তা (জীবন কথা)	—রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৯
১১।	২৬৩ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর		২৬৯
১২।	দুটো আলোর ফুটকি (বিদেশী গল্প)	—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	২৭০
১৩।	কুতুর চ্যালেঞ্জ (মজার ছবি) ...		২৭৫
১৪।	খোদনের খ্যাতিলাভ (গল্প)	—স্বপনবুড়ো	২৭৬
১৫।	২৭৫ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর		২৭৯
১৬।	ঘুঘুর ভাই ফাঁদ (ছবিতে গল্প)	—মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায় ...	২৮০
১৭।	চোরের শাস্তি (গল্প)	—হিমালয়নির্ঝর সিংহ	২৮২
১৮।	বীর ছেলে বাংলার (ধারাবাহিক উপন্যাস)	—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	২৮৫
১৯।	তিনের জয় (রিপ্লে থেকে)		২৯১
২০।	হুন দমন প্রভাকরবর্দ্ধন (অমর বীর কাহিনী)	—শ্রীমধুসূদন মজুমদার	২৯২
২১।	চোখের ভুল (মজার ছবি)		২৯৯
২২।	হাঁদা-ভোঁদার পুরস্কারপ্রাপ্তি (ছবিতে গল্প)		৩০০
২৩।	অপরাজেয় টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)	—সব্যসাচী	৩০২
২৪।	"৺রজত সেন স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)		৩০৮
২৫।	বড় কে (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	—সুশীল চক্রবর্তী	৩০৯
২৬।	বিড়াল তপস্বী (রিপ্লে থেকে)		৩১১
২৭।	কর্মবীর (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	—পীযূষকান্তি দত্ত	৩১২
২৮।	মজার দেশ (কবিতা)	—বিশ্বজিৎ পাল	৩১৬
২৯।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...		৩১৭

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং শ্যামাপুকুর লেন কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য টা. ১·২৫

টিনোপালে*র নতুন নাম

রানীপাল+

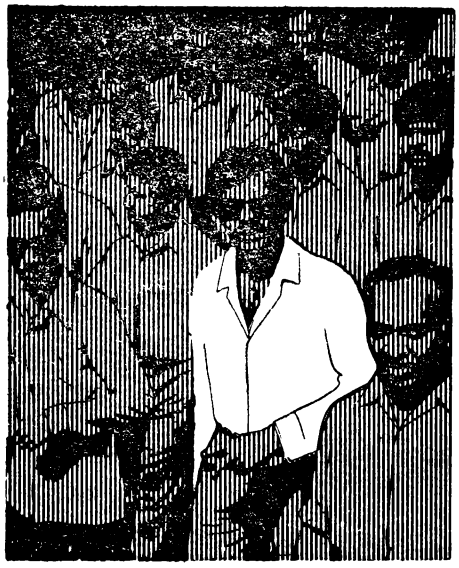

সুতীর কাপড়ের জন্যে
রানীপাল+

ব্লেণ্ডেড ও সিন্থেটিক
কাপড়ের জন্যে
রানীপাল+-এস

সেই জিনিষ, সেই কাজ, নতুন নামে এল আজ

সবচেয়ে সাদা করার জন্যে রানীপাল

Suhrid Geigy
LIMITED

+ সুহৃদ গায়গী লিমিটেডের ট্রেডমার্ক * সিবা-গায়গী লিমিটেডের লাইসেন্স'এর অধীনে এতকাল বাজারে বিক্রী হয়েছে।

Shilpi SGT 6/76 ben

ঊনত্রিংশ বর্ষ ● ৪র্থ সংখ্যা ● ১৩৮৩, জ্যৈষ্ঠ

মন্দমতি মন্দাকিনী

কৌশিক মুখোপাধ্যায়

আট বছরের মন্দাকিনী
মুখের কথায় মিষ্টি ঝরে,
তার যে এমন মন্দমতি
জানতো না কেউ ঘুণাক্ষরে ;
জানতো না তার নিজের পিসি
জানবে কি সে অন্যজনা,
হঠাৎ সেদিন প্রকাশ পেল
মন্দাকিনীর গুণপনা।
শনিবারের সন্ধ্যাবেলা
পিসি ছিলেন ঠাকুরঘরে,
মন্দাকিনী চুপিচুপি
ডাকলো ফোনে আকুল স্বরে,
"হ্যালো হ্যালো ফায়ার ব্রিগেড,
জলদি আসুন বিডন স্ট্রীটে,
দারুণ আগুন লেগে গেছে
আমাদের এই বারোর C তে।"

আর কথা নেই। আচম্বিতে
হকচকিয়ে জাগল পাড়া,
ঝনঝনিয়ে ঢনঢনিয়ে
ঘণ্টা দিয়ে আসছে তারা,
আসছে বড়োবাজার থেকে,
শিয়ালদহের স্টেশন থেকে,
আসছে তারা পুরো দমেই
কল বাগিয়ে ভীষণ বেগে ;

আগুন ! আগুন ! মইটা আনো,
হাইড্রাণ্টের ঢাকনা তোলো,
হোসপাইপে জল ভরে নাও
বন্ধ সকল জানলা খোলো !

চ্যাঁচায় সবাই চতুর্দিকে
বাধায় তুমুল গণ্ডগোল,
জলের তোড়ে ঘরের ভিতর
বিছানা-পত্র ভিজে ঢোল ;
পাশেই ছিল কলাভবন
দেয়ালভরা ছবি তার,
জলের স্রোতে এক মিনিটে
ধুয়ে মুছে পরিষ্কার !
কাণ্ড এমন ঘটতে কতই
ভাবলে পরে শিউরে গা,
মন্দাকিনীর পিসি এসে
চাপা দিলেন ব্যাপারটা ;
মিষ্টি-কথার সঙ্গে তিনি
বিশটি টাকা দিলেন নিট,
তখন আগুন নিভে গিয়ে
ঠাণ্ডা হল বিডন স্ট্রীট।

লাল গ্রহ মঙ্গল

সূর্য থেকে দূরত্ব বিচারে পৃথিবী হল তৃতীয় গ্রহ, আর চতুর্থ হল মঙ্গল। অতি উজ্জ্বল গ্রহ এই মঙ্গল বা মার্স, প্রায় সিরিয়াস নক্ষত্র বা শুক্রগ্রহের সমানই উজ্জ্বল। তবে মঙ্গলের দীপ্তি বেশ একটু রক্তিম, যার জন্য প্রাচীনেরা মঙ্গলকে (বা মার্সকে) যুদ্ধের দেবতা বলে কল্পনা করেছেন।

মঙ্গলের দিনের দৈর্ঘ্য প্রায় পৃথিবীর দিনের সমানই। এর একটি বায়ুমণ্ডল আছে, মেঘ আছে, উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে তুষার মুকুট আছে দুইটি। মেরু-মুকুট বাদে মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের আধাআধির কিছু বেশী কমলা-গেরুয়া মিশ্রিত রংয়ের। বাদ-বাকী প্রায় অর্ধেকের রং নীল ধূসর বা সবুজ। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই শেষোক্ত স্থানগুলিকে মনে করতেন সমুদ্র বলে। আর সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্র পর্যন্ত অবলম্বিত রেখাগুলিকে বিবেচনা করতেন মঙ্গলবাসী জীবদের দ্বারা খনিত খাল বলে। বর্তমান যুগে অবশ্য সে-সব ধারণাকে ভিত্তিহীন বলেই মনে করা হচ্ছে।

মঙ্গলগ্রহে উচ্চমানের জীব আছে কি না, তা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই বিতর্ক চলে আসছে। এখনও মীমাংসা হয়নি সে বিতর্কের।

দুইটি চাঁদ আছে মঙ্গলের, ডেইমস্ ও ফোবস।

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

বেলা পড়ে আসছে তখন।

রামকৃষ্ণপুর ঘাটে ক্রেন জেটির ওপর বসেছিল পাণ্ডব গোয়েন্দারা—বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু। কানা পঞ্চুও সঙ্গে ছিল। ওরা বসে বসে বড় বড় গাদা বোটে ওয়াগনের মাল বোঝাই করা দেখছিল। ওয়াগন খালাস করা মালগুলো ক্রেনের সাহায্যে বোঝাই হচ্ছিল গাদা বোটে।

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চু ভৌ ভৌ করে উঠল কি যেন একটা দেখে।

বাচ্চু-বিচ্ছুরও নজর পড়ল সেদিকে।

ওরা দেখল পড়ন্ত বেলায় গঙ্গার জোয়ারে কি যেন একটি ভেসে ভেসে আসছে। একটা ঝকঝকে চকচকে কৌটোর মতো। তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে দৃষ্টি যেন ঠিকরে যাচ্ছে।

বাবলু বলল—কি বল দেখি ওটা?

বিচ্ছু বলল—মনে হচ্ছে সিগারেটের কৌটো।

বিলু বলল—কোন রকমে আনা যায় না ওটাকে?

বাবলু বলল—যাবে না কেন, তবে জামা-প্যাণ্ট ছাড়তে হবে। ভেতরে জাঙ্গিয়া আছে অবশ্য। কিন্তু গা মুছব কি করে?

ভোম্বল বলল—তুই না। আমি আনছি। বেশী দূরে নেই। একটুখানি সাঁতার কেটে যেতে পারলেই ব্যস। একেবারে হাতের মুঠোয়। এই বলে ভোম্বল জামা-প্যাণ্ট ছাড়বার উপক্রম করছে এমন সময় হঠাৎ মাঝিদের একজন ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

মাঝিটা স্নান করে গা ধোবে বলে জলে নামল। গ্রীষ্মের দিন। পড়ন্ত বেলায় দেহের ক্লান্তি দূর করতে গেলে স্নানের চেয়ে তৃপ্তিকর আর কিছুই নেই।

বাবলু বলল—ঐ কৌটোটা আমাদের এনে দেবে মাঝিভাই?

মাঝিটা অবাঙালী। বোধহয় মুসলমান। বলল—কিধার হ্যায়?

—ঐ যে ভেসে আসছে।

মাঝি অল্প একটু সাঁতরে গিয়ে কৌটোটা নিয়ে এসে বাবলুর হাতে দিল।

বাবলুরা তো কৌটো পেয়ে খুব খুশী। জেটির ওপর বসে বসেই আনন্দের চোটে কৌটোটা খুলে ফেলল বাবলু। কিন্তু কৌটো খুলেই অবাক্। দেখল কৌটোর ভেতরে কাগজের মোড়কে একটা চিঠি লেখা আছে। ওপরেই লেখা আছে 'আমাকে বাঁচান।'

ওরা সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ করা কাগজটা খুলে ফেলল। তাতে যা লেখা ছিল তা এই—প্রিয় মহাশয়, যদি কেউ আমার এই চিঠিটা পান তাহলে অনুগ্রহ করে পুলিসে খবর দিয়ে আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন। ডায়মণ্ড হারবারের কাছে গঙ্গা-তীরবর্তী একটি সুড়ঙ্গ-ঘরে শয়তানের ঘাঁটিতে আমি এবং আমার ছেলে বন্দী আছি। জায়গাটার নাম জানি না। তবে স্থানটি গঙ্গার ওপারে মেদিনীপুর জেলার দিকে। গঙ্গার দিকে এর একমাত্র প্রবেশপথের সুড়ঙ্গটি জোয়ারের সময় জলে ডুবে থাকে, আর ভাঁটার সময় জাগে। আমরা এখানে মৃত্যুর দিন গুনছি। আমার চিঠি পেয়ে কেউ বাঁচালে আমি তার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব! ইতি—

দীপঙ্কর বোস।

চিঠিটা পড়েই বাবলুরা অবাক্ হয়ে গেল। লোকটাকে কেন, কি কারণে যে শয়তানরা আটকে রেখেছে সে সব কিছুই লেখেনি সে। শুধু তাকে উদ্ধার করতে হবে সেই কথাই লিখেছে।

বিলু বলল—কি করবি রে বাবলু?

—ভদ্রলোককে উদ্ধার করব।

—কিন্তু কেমন করে?

—যেমন করেই হোক।

ভোম্বল বলল—ব্যাপারটা কিন্তু খুব সাংঘাতিক। মনে কর, কোথায় ডায়মণ্ডহারবার। সেইখানে জলে ডোবা সুড়ঙ্গ। বেশ রীতিমতো সার্চ না করলে সেটাকে আবিষ্কার করাই যাবে না।

বাবলু বলল—রীতিমতো ভাবেই সার্চ করব। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখব জায়গাটাকে।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল—কিন্তু কেমন করে?

—সেইটাই তো মাথা খাটিয়ে বার করতে হবে আমাদের।

বিলু বলল—ওখানে গঙ্গার যা ভয়াবহ রূপ তাতে ছোট নৌকায় করে ঘোরা অসম্ভব। তা ছাড়া চারদিকেই তো অকূল পাথার।

বাবলু বলল—ওভাবে নয়। যেমন করেই হোক একটা লঞ্চের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভোম্বল বলল—তাহলে তো জল-পুলিসকে বললেই একটা লঞ্চের ব্যবস্থা হয়ে যায়?

বিলু বলল—সেই ভালো। ব্যাঁটরা থানায় মিঃ কাঞ্জিলালকে গিয়ে ধরি চল। তিনি একবার বলে দিলে জল-পুলিস নিশ্চয়ই আমাদের লঞ্চের ব্যবস্থা করে দেবে।

বাবলু একটু গম্ভীরভাবে বলল এবার—দেখ, তোরা কিন্তু আমাদের আদর্শের কথাটা একেবারেই ভুলে যাচ্ছিস। আমাদের কাজ হল কালপ্রিটদের খুঁজে বার করে বামাল সমেত পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেয়া। কিন্তু আগেই যদি পুলিসকে জানিয়ে দিই তাহলে আমাদের করণীয় কি রইল? সুতরাং আগে আমরা চেষ্টা করে দেখি। কেন না এমনও তো হতে পারে কেউ তামাশা করবার জন্যে বা অযথা পুলিসকে হয়রানি করবার জন্যে মিথ্যে করে চিঠিটা লিখে কৌটোর মধ্যে পুরে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে! হতে পারে নাকি?

বিলু বলল—এ হতে পারে না।

বাবলু বলল—চিঠিটা যেভাবে লেখা হয়েছে তাতে তাই অবশ্য মনে হয়। মনে হয় এটা মিথ্যে নয়। কিন্তু সত্যও তো না হতে পারে? কত রকমের বদমাইশ লোক আছে সমাজে, তার খোঁজ-খবর রাখিস? এমন অনেক লোক আছে

যারা পুলিস বা ফায়ার ব্রিগেডের লোককে তাদের বাবার চাকর অথবা ইয়ারের লোক বলে মনে করে। আগুন লাগার মিথ্যে খবর দিয়ে দমকলে টেলিফোন যে কতবার এসেছে তার ঠিক নেই। তেমনি খুন দাঙ্গার ফলস্ টেলিফোনও পুলিসের কাছে এবেলা ওবেলা আসে।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল—তা অবশ্য সত্যি।

বিলু বলল—তাহলে এখন আমাদের করণীয় ?

—কাল সকালেই মিটিং ডেকে আমাদের সেটা ঠিক করে নিতে হবে। এখন ফেরা যাক। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

ওরা আর বিলম্ব না করে ঘরে ফিরে চলল।

পরদিন সকালে মিত্তিরদের বাগানে ভাঙা গ্যারেজ ঘরে পাণ্ডব গোয়েন্দারা একে একে জড় হল সকলে। বাবলুর হাতে কালকের সেই চিঠিটা।

বিলু বলল—এ সম্বন্ধে কিছু ভেবেছিস বাবলু ?

—হ্যাঁ। কাল সারারাত ধরে শুধু ভেবেছি। রাতে আমার ঘুম হয়নি।

—কি ভাবলি ?

—ভাবলাম, আজ দুপুরের মধ্যেই আমরা সকলে ডায়মণ্ডহারবার চলে যাবো।

ভোম্বল বলল—আমাদের কোন প্রস্তুতিই তো নেই। তা ছাড়া শুধু শুধু ডায়মণ্ডহারবারে গিয়েই বা করব কি ?

—যা করবার সে তো আমি করব। তোরা শুধু আমাকে সাহায্য করবি।

বাচ্চু বলল—আমার মনে হয়, এ কেসটা আমাদের হাতে না নেওয়াই উচিত।

ছোট্ট মেয়ে বিচ্ছু বলল—আমার মনে হয় এই কেসটা একমাত্র আমাদেরই হাতে নেয়া উচিত। এবং আজই একবার চলে যাওয়া উচিত ডায়মণ্ড-হারবারে।

বাবলু বলল—হ্যাঁ। এখন সাতটা বাজে। সবাই যা। তাড়াতাড়ি দুটো খেয়ে নিয়ে লঞ্চে পার হয়ে বাবুঘাটে চলে যা।

বাবলুর আদেশ। অতএব যেতেই হবে। সবাই যে যার ঘরের দিকে ফিরে গেল।

অল্প সময়ের মধ্যেই সবাই তৈরি হয়ে চলে এল বাবুঘাটে। ওরা আসবার আগেই বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ৭৬ নম্বর বাসের কাছে। বাবলু তৈরী হয়েই এসেছিল। সঙ্গে পিস্তল, ছোরা আত্মরক্ষার জন্য সবকিছু নিয়ে এসেছিল।

বাসের কণ্ডাক্টার ওদেরকে দেখেই বলল—তোমরা কোথায় যাবে ভাই ?

—আমরা ডায়মণ্ডহারবারে যাব।

—এই কুকুরটাও যাবে নাকি ?

—হ্যাঁ।

—বাসে করে আমি কুকুর নিয়ে যেতে পারব না।

—কেন ? আমরা ওর পুরো ভাড়া দেব।

—নিয়ম নেই। পুলিসে ধরবে।

—ধরবে না। আমরা বলছি, তোমার কোন ভয় নেই।

—আমি পারব না বলছি !

এক ভদ্রলোক জানালার ধারের একটা সিটে বসেছিলেন। ভদ্রলোক এদের দেখেই বললেন—আরে, এদের কুকুর নিয়ে নাও। ছেলেমানুষ এরা, মনে কষ্ট পাবে। অতএব আর না করল না কণ্ডাক্টার। গজগজ করতে করতে তুলে নিল পঞ্চুকে। পঞ্চুও দিব্যি একটা সিটের তলায় ঢুকে চোখ বুজে শুয়ে রইল গুটিসুটি মেরে।

কণ্ডাক্টার বলল—এটা তো একটা নেড়ি কুত্তা। এটাকে সঙ্গে করে কেন নিয়ে চলেছ ভাই সব ? একটা জাতের কুকুর হলেও তবু জানতাম।

ভদ্রলোক বললেন—জাতের কুকুর। ওরে বাবা। গান্ধিজী জাতিভেদ দূর করতে বলেছেন না।

ভদ্রলোকের কথায় বাবলুরা খুব খুশী।

বাবলু বলল—আপনি কোথায় যাচ্ছেন দাদা?

—তোমরা কোথায় চলেছ?

সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজনের চোখে চোখে ইশারা হয়ে গেল।

—না। এমনি ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে যাচ্ছি।

—ভালো ভালো। খুব ভালো জায়গা। তুমিই কি এদের লিডার?

বাবলু হেসে বলল—লিডার আর কি? আমরা সকলে মিলেমিশে চলি।

—খুব ভালো। তোমরাই তো বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা?

এমন সময় একজন ফ্যাণ্টাওয়ালা বাসে ফ্যাণ্টা বিক্রি করতে উঠল।

অমায়িক ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা ফ্যাণ্টা কিনে অফার করলেন ওদের।

ওরাও খাবে না, ভদ্রলোকও ছাড়বেন না। বললেন—দেখো বাবা, আমি একলা মানুষ। বিজনেসম্যান। টাকা পয়সারও অভাব নেই আমার। তোমরা আমার ভাইপো ভাইঝির মতো। ছোট ছেলেমেয়েদের আমি খুব ভালবাসি। তাদের খাওয়াতে পারলে আমার ভীষণ আনন্দ হয়।

বাবলু বলল—কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা তো বললেন না? আপনার পরিচয়?

—পরিচয় তো দিলাম। আমার নাম বি. মিত্র। আমিও ডায়মণ্ডহারবার যাচ্ছি।

—বেড়াতে নাকি?

—না। আমাদের একটা জাহাজ আসবার কথা আছে। তাই দেখতে যাচ্ছি।

—জাহাজ কি আপনাদের নিজস্ব নাকি?

—না। আমাদের লঞ্চ আছে। জাহাজে কিছু মাল আসবে। সেই মাল নিয়ে আসব লঞ্চে করে।

বাবলু বলল—একটা অনুরোধ করব আপনাকে?

ভদ্রলোক হেসে বললেন—নিশ্চয়ই।

—আপনাদের নিজেদের যখন লঞ্চ আছে তখন অনুগ্রহ করে একটা লঞ্চ কিছুক্ষণের জন্য দেবেন আমাদের? একটু বেড়াব।

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠে বললেন—এই কথা? তা বেশ তো। তোমরা ডায়মণ্ডহারবারে নেমে জলযোগ সেরে এদিক সেদিক যদি একটু ঘুরতে চাও তো ঘুরে নিও। ততক্ষণে আমি লঞ্চের ব্যবস্থা করে রাখবো। লঞ্চের নাম রঞ্জন। মনে থাকবে তো?

—নিশ্চয়ই মনে থাকবে।

যথাসময়ে বাস ছাড়ল। আবার যথাসময়ে বাস পৌঁছেও গেল।

ডায়মণ্ডহারবারে নেমে ভদ্রলোক মানে মিঃ মিত্তির বললেন—তাহলে খানিক বাদে এস তোমরা। আমি ততক্ষণ লঞ্চের ব্যবস্থা করে রাখি। রোদের তেজটাও এখন বড্ড চড়া। রোদটা একটু পড়লে এস। কেমন? আমিও থাকব। আমি তোমাদের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব।

বাবলুরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বিলু বলল—সত্যি। ভগবান খুব সহায় আমাদের। কি বল?

—সে কথা আবার বলতে?

গঙ্গার ধারেই বাস থেমেছিল। তাই গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বিচ্ছু হঠাৎ বলে উঠল—ভগবান আমাদের সত্যিই সহায়। ঐ দেখ ভাটার টান আরম্ভ হয়েছে।

বাবলুও উল্লসিত হয়ে বলল—তাই তো রে! ঘণ্টা দুই বাদে আমরা যখন লঞ্চে ভ্রমণ করব তখন

নিশ্চয়ই সেই সুড়ঙ্গমুখ দেখতে পাব। কেন না সুড়ঙ্গটা জোয়ারে ডুবে থাকে এবং ভাটার সময় সামান্য একটু জাগে।

ওরা কথা বলতে বলতে যখন বাঁধের ওপর থেকে নীচে গঙ্গার গর্ভের কাছে মনোরম হারবারে নেমে এল, তখন ওরা দেখতে পেল চারদিকে কত সব পিকনিক পার্টি পিকনিক করতে বসেছে।

বিলু হঠাৎ বলল—ঐ দেখ বাবলু, সব আমাদের পাড়ার ছেলে। বাবুয়া, বুকান, দীপে, শঙ্কর, তাপস, যোগে, খোকন ও অনুপ।

ভোম্বল বলল—আরে! তপাইদাও এসেছে দেখছি।

বিচ্ছু বলল—তপাইদা? কোন্ তপাইদা?

—তপাই ব্যানার্জী। কদমতলায় কাঁটাপুকুরে থাকে। তুই অবশ্য চিনবি না। দেপনের ভাগ্না।

বলতে বলতেই তপাইদা এসে হাজির—কি ব্যাপার রে? তোরা এখানে? নিশ্চই কোন অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছিস?

ভোম্বল বলল—না না। ওসব কিছু নয়। এমনি বেড়াতে এসেছি।

বাবলু ইশারায় ওদেরকে বেশী কথা বলতে বারণ করে বলল—চল, একটু এদিক ওদিক করে ঘুরে আসি চল। বলে ওদের কাছ থেকে খানিকটা তফাতে গিয়ে একটু নিরিবিলিতে বসল। তারপর গঙ্গার দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির দিকে চেয়ে রইল ওরা।

রোদের তেজ তখনো যথেষ্ট। গঙ্গার ওপারে দূরে অনেক দূরে ওদের অভিযান। মিত্তিরবাবুর লঞ্চটা একবার পেলে হয়। ভগবান যে এভাবে ওদের সহায় হবেন তা ওরা ভাবতেও পারেনি!

যাই হোক, বেলা একটু পড়ে এলে ওরা নির্দিষ্ট জায়গায় গেল। দেখল হাসিমুখে সুন্দর চেহারার মিত্তিরবাবু ওদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। লঞ্চও রেডি।

কি চমৎকার লঞ্চ! সবুজ রঙ। যেন একটি লম্বাটে ডিম। বাবলু বলল—আরে! এ লঞ্চটাকে তো আমরা প্রায়ই দেখি রামকৃষ্ণপুরঘাটে যাতায়াত করতে।

ওরা লঞ্চে উঠতেই মিত্তিরবাবু বললেন—কোন্ দিকে যাবে বল?

বাবলু বলল—গঙ্গার ওপারে।

মিত্তিরবাবু বললেন—খুব ভালো করে রড ধরে বসে থাক, কেমন? কেন না অসম্ভব রকমের জোরে ছুটতে পারে আমার এই ক্ষুদে লঞ্চ।

বাবলুরা সকলে শক্ত করে রড ধরল।

মিত্তিরবাবু বললেন—রেডি?

—রেডি।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গার ঘোলাটে জল তোলপাড় করে উল্কার গতিতে ছুটে চলল লঞ্চখানা। কিছু সময়ের মধ্যেই ওপারে পৌঁছে গেল ওরা। ওপারে গ্রাম মাঠ ঘন বন। কিন্তু সেই সুড়ঙ্গ? সুড়ঙ্গ কোথায়?

লঞ্চ ওপারে যেতেই একটা ছোট্ট নৌকো এসে ভিড়ল লঞ্চের গায়ে। মিত্তিরবাবু বললেন—চল, একটু ডাঙাটা বেড়িয়ে আসা যাক।

ওপারে কোন জেটি নেই। তাই নৌকোয় করে ডাঙায় পৌঁছুল ওরা। একটা মোটা দড়ি লঞ্চে বেঁধে ডাঙার একটা গাছের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা হল, যাতে লঞ্চটা ভেসে না যায়।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং কানা পঞ্চু সকলেই ওপারের মুক্ত অঞ্চলে গিয়ে যারপর-নাই খুশী হল। কিন্তু সব চেয়ে ক্ষুণ্ণ হল কাছাকাছি কোন সুড়ঙ্গ না দেখে।

মিত্তিরবাবু বললেন—কেমন লাগছে জায়গাটা?

বাবলু বলল—খুব ভালো। খরের

মিত্তিরবাবু বললেন—কিন্তু তোমরা এখানে এসে এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলে কেন ভাই ?

বাবলু বলল—ও কিছু না।

—আমার যেন মনে হচ্ছে তোমরা কি একটা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছ ?

বাবলু বলল—না না। সে রকম কিছু না।

—বলা যায় না। যা সাংঘাতিক ছেলেমেয়ে তোমরা ! এই বয়সে একলা বেড়াতে বেরিয়েছ। একি সকলে পারে নাকি। তা যাক। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এখানে একটা ডাকাতে কালীর মন্দির আছে। সেই মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে ফিরে যাই চল।

বাবলু বলল—ঠিক বলেছেন। সময়মতো না ফিরলে বাড়ি পৌঁছুতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

মিত্তিরবাবুর সঙ্গে ওরা ঝোপ-জঙ্গল পেরিয়ে একটা ভাঙা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ মিত্তিরবাবু খুব জোরে একটা শিস দিয়ে উঠলেন। যেই না শিস দেয়া অমনি চারদিক থেকে জনা দশেক লোক গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঘিরে ফেলল ওদের।

কি ভয়ানক সব চেহারা ওদের ! কালো কালো ষণ্ডামার্কা ভয়ংকর চেহারা ! তারা এসেই সেলাম ঠুকে দাঁড়াল মিত্তিরবাবুর সামনে।

মিত্তিরবাবু গম্ভীর গলায় বললেন—এই ছেলে-মেয়েগুলো অত্যন্ত চালু। এদের মতলব ভালো নয়। মনে হচ্ছে কোন রকমে এরা আমাদের ঘাঁটির খবর জানতে পেরেছে। ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেছে এদের সঙ্গে। ভালোই হয়েছে। কবজায় যখন পেয়েছি তখন আর ছাড়ছি না। যাও। যথাস্থানে ঢুকিয়ে দাও এদের।

চোখের পলকে বাবলুরা দেখল শয়তানরা পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলল ওদের। পারল না পঞ্চুকে ধরতে। বেগতিক দেখে সে যে নিমেষে কোথায় লুকাল তার টেরও পেল না কেউ।

বাবলু বলল—ছেড়ে দিন। আমরা আপনাদের কি করেছি ? আমাদের ছেড়ে দিন।

মিত্তিরবাবু বললেন—আমরা যাকে ধরি তাকে ছাড়ি না। আচ্ছা, গুডবাই।

সেই অন্ধকার ভাঙা মন্দিরের ভেতরে গিয়ে শয়তানরা ওদের পাঁচজনকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখল কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় আবার ওদের তুলে নিয়ে ধাপে ধাপে ক্রমশঃ নিচের দিকে নামতে লাগল। অনেকটা নামার পর একটা স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা ঘরের মেঝেয় ওদের নামিয়ে হাত পায়ের বাঁধন খুলে চোখের বাঁধন মুক্ত করে দিয়ে চলে গেল ওরা।

ঘরের ভেতর কোথাও কোন আলো নেই ! যা আছে তা হল শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। ঘন অন্ধকারে চারদিক এমনভাবে ঢাকা যে কেউ কারো মুখ পর্যন্ত দেখতে পেল না। ওরা অসহায়ভাবে সেই অন্ধকারে ভূতের মতন বসে রইল পাঁচজনে।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর এক সময় ওরা দেখল দুজন লোক আলো হাতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। হ্যারিকেনের আলো। তাতেই ওরা দেখতে পেল বহুদিনের জরাজীর্ণ মন্দিরের তলদেশের পলেস্তারা খসা একটা গোপন কক্ষে রয়েছে ওরা। বাইরের আলো বাতাস এখানে প্রবেশ করে না। শুধু সিঁড়ির ওপরে যে দরজাটা রয়েছে তারই মাথার ওপর ছোট ছোট পরপর তিনটে ঘুলঘুলি রয়েছে। যার ভেতর দিয়ে বাতাস চলাচল করে।

যে দুজন লোক এল, এদের দুজনকেই ওরা চেনে। শয়তান চেহারার লোক। এরাই মিত্তির-বাবুর আদেশে ওদেরকে এখানে এনেছে। তাদের

একজনের হাতে খাবার, অপরজনের হাতে আলো। যার হাতে খাবার রয়েছে তার অপর হাতে একটা জলের কুঁজোও রয়েছে। কুঁজোর মুখে একটা গেলাস ঢাকা।

বাবলু বলল—তোমরা কেন মিছিমিছি আমাদের ধরে রেখেছ? এখনো বলছি ভালো চাও তো ছেড়ে দাও আমাদের।

আলো হাতে লোকটি রক্তচক্ষুতে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল—কথা বল না। বেশী কথা বলা আমরা পছন্দ করি না।

বিলু বলল—কি পছন্দ কর তবে তোমরা? ডাকাতি করতে?

লোকটা ঝপ করে এক হাতে বিলুর চুলের মুঠি ধরে অপর হাতে ঠাস করে ওর গালে মারল এক চড়। কি দারুণ ওজন সেই চড়ের! বিলুর কান মাথা যেন ভোঁ ভোঁ করে উঠল।

বিচ্ছু ভয়ে বাচ্চুকে জড়িয়ে ধরল।

ভোম্বল আর বাবলু একটু পিছিয়ে এল। বাবলুর একটা হাত তখন পকেটে ঢুকে গেছে। পিস্তলে একদম গুলি ভরতি, তৈরি ছিল। হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরল সেটাকে।

যে লোকটির হাতে খাবার ছিল সে খাবার রেখে বলল—খেয়ে-দেয়ে চুপটি করে শুয়ে থাক সব। কাল সকালে মিত্তিরবাবু এসে যেমনটি বলবেন সেই রকম কাজ হবে। তোমাদের এই পাঁচ পাঁচটি ক্ষুদে লাশকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে একটুও হাত কাঁপবে না আমাদের।

বাবলু একবার ভাবল পিস্তলটা বার করে শয়তান দুটোর মাথার খুলি নিমেষে উড়িয়ে দেয়! কিন্তু তা সে করল না। এদের ঘাঁটিটাকে ভালো করে না জেনে আগে ভাগেই গণ্ডগোলটা করে বসা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

লোকটা বিলুর চুলের মুঠি ধরে মারল এক চড়।

লোক দুটো যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

বাবলু বিলুকে বলল—শুধু শুধু গোঁয়ারটার সঙ্গে ফড়ফড় করতে গেলি কেন?

বিলু বলল—ঐটাই ভুল হয়ে গেছে।

যাই হোক, ওরা আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে খেতে বসে গেল। রুটি আর আলুর দম। এই তো খাবার। খেয়ে-দেয়ে ওরা প্রত্যেকে এক গেলাস করে জল খেয়ে নিল। তারপরই শুরু হল ওদের আসল কাজ।

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ওরা ঘরের

ভেতরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। বাব্‌লু অবশ্য সর্বাগ্রে একবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে দেখে এল। ওপরের দরজাটা কোন রকমে ভেতর থেকে খোলা যায় কি না। কিন্তু না। ঠেলে ঠুলে বুঝল ও আশা একেবারেই বৃথা! তাই ওরা পাঁচজনে এদিক সেদিকে ঘুরেফিরে দেখতে লাগল, পালাবার আর কোন দ্বিতীয় পথ আছে কিনা।

হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে ওরা সবাই থেমে দাঁড়াল।

বাবলু বলল—শুনছিস?

—হুঁ।

—কাঁসর ঘণ্টার শব্দ। বোধহয় কোথাও পুজো আরতি হচ্ছে।

—কিন্তু এই জঙ্গলে কোথায় হচ্ছে এ সব?

—আমার মনে হয় এই মন্দিরেই কোথাও না কোথাও ডাকাতে কালী আছেন। শয়তানরা তাঁরই পুজো করছে।

—তা না হয় হল। কিন্তু শব্দটা আসছে কোথা থেকে?

এমন সময় হঠাৎ একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। ওরা দেখল ছোট্ট একটা আলমারি দেয়ালের গায়ে আড়াল করা ছিল। তার পিছনটা আলোকিত হয়ে উঠল।

ওরা সকলেই এগিয়ে গেল সেই দিকে। আলোটাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাবলুর হাতে লণ্ঠন ছিল। তার সাহায্যেই ওরা বুঝতে পারল আলমারিটা সরালেই ওদিকে যাবার রাস্তা পাবে ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে ধরাধরি করে সরিয়ে ফেলল আলমারিটা। আর সেটা সরাতেই ওপাশে যাবার পথ পেয়ে গেল ওরা।

কিন্তু আলো? আলো কই? এখানে যে ঘন অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। যাক। হাতে লণ্ঠনটা তো আছে। তারই সাহায্যে ওরা দেখল খানিক যাবার পর আবার কয়েকটা ধাপ সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে ক্রমশঃ।

এমন সময় হঠাৎ এক বিস্ময়। শূন্য থেকে যেন একটা ঢিল অব্যর্থভাবে উড়ে এসে ঠং করে লণ্ঠনের কাঁচে লেগে কাঁচটাকে চুরমার করে নিভিয়ে দিল আলোটাকে।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের।

কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ এখান থেকে বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সিঁড়ির কাছে আসতে সেটা দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ওরা সিঁড়ির কয়েক ধাপ নামতেই দেখল সিঁড়িটা বাঁদিকে বেঁকে আরো কয়েক ধাপ নেমে গেছে। আর সেইখানেই ওরা সেই ঘন অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোর আভাস পেল।

খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ওরা কয়েক ধাপ নামতেই দেখতে পেল এক ভয়ংকরী কালী প্রতিমার সামনে সারি সারি শয়তানরা বসে আছে। দুজন কাঁসর ঘণ্টা বাজাচ্ছে এবং একজন ভয়ংকর চেহারার কাপালিকের মতো সন্ন্যাসী আরতি করছে সেই দেবী প্রতিমার। খানিক বাদে আরতি শেষ হতেই ওরা দেখল, যে সন্ন্যাসী আরতি করছিল সে তার নকল দাড়ি এবং জটা খুলে রাখল একপাশে।

বাবলু বলল—উঃ! কি সাংঘাতিক! দেবীর সঙ্গেও ছলনা?

বিলু বলল—তোর কাছে তো যন্তর রয়েইছে। দে না সব ব্যাটাকে শুইয়ে।

বাবলু বলল—এখনো সময় হয়নি। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। আলমারির পিছনে আমাদের আলো দেখিয়ে এদিকে যে পথ আছে তার ইঙ্গিত দিল কে? কে

আমাদের ঢিল ছুঁড়ে লণ্ঠনের কাঁচ ভেঙে দিল? ভেঙে দিয়ে উপকার করল কে?

বিলু বলল—উপকার করল? অপকার করল বল!

—না। উপকার করল। আলো হ'তে আমরা এখানে এসে পড়লেই শয়তানগুলোর চোখে পড়ে যেতাম।

বাবলুর কথা শেষ হতে না হতেই ওরা আর এক বিস্ময়ের মুখোমুখি হল। হঠাৎ শক্তমতো কি একটা জিনিস ঝুপ করে বাবলুর কোলে এসে পড়ল। আর সেই সঙ্গে সিঁড়ির উপর দিয়ে লঘু একটা পদশব্দ মিলিয়ে গেল সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারে।

বাবলু জিনিসটা হাতে নিয়ে বুঝল, এটা অন্য কিছু নয়, ছোট্ট একটা টর্চ। যা এই অসময়ে ওদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। বাবলু বলল—উঃ! ভগবান সহায়। আমি সব এনেছি। অথচ এই একটি মাত্র জিনিস নিয়ে আসতেই কি সাংঘাতিক ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু কে? কে এই মৃত্যুপুরীতে আমাদের এইভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে? একি কোন মানুষ না কোন অশরীরী প্রেতাত্মা?

প্রেতাত্মার কথা মনে আসতেই ওদের প্রত্যেকেরই গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল।

যাই হোক, সিঁড়িতে বসে বসেই ওরা দেখতে পেল সেই ভয়ংকর চেহারার শয়তানগুলো একে একে চলে গেল ঘর থেকে। ঘরের ভিতর তখন সামান্য একটি মাটির প্রদীপের আলো ছাড়া আর কোন আলো ছিল না।

ওরা পাঁচজনে এসে মা কালীর সেই ভয়ংকরী মূর্তির সামনে দাঁড়াল। তারপর পিছন দিকে গিয়ে টর্চের আলো ফেলতেই দেখতে পেল, একটি ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু আলোর রেখা ভেসে আসছে। ঘরের দরজায় শিকল দেয়া। শিকল খুলে ঘরে ঢুকেই ওরা যা দেখল তাতে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না ওদের। ওরা দেখল ঘরের ভিতর বেশ কয়েকটি আশ্চর্য সুন্দর কারুকার্য সমন্বিত স্বর্ণপ্রতিমা সারি দেওয়া আছে। কোনটি দুর্গা, কোনটি কালী, শিব, গণেশ এমন কি আঙ্কোরভাটের অনুকরণে প্রাচীন একটি সোনার বিষ্ণুমূর্তিও রয়েছে সেখানে। যার আর্থিক মূল্য খুব কম করেও বিশ লক্ষ টাকা তো হবেই।

বাবলু বলল—এ যে দেখছি অতি সাংঘাতিক ধরনের স্মাগলারদের আড্ডায় এসে পড়েছি আমরা!

বিলু বলল—এখান থেকে বেরোবার উপায়?

—সেটা খুব সাবধানে করে নিতে হবে। তবে কোন কিছু করবার আগে সর্বাগ্রে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে দীপঙ্কর বোসকে। যাকে উদ্ধার করবার জন্যই আমাদের এখানে আসা।

ওরা আস্তে আস্তে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। একটা ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল ঘরের দরজার সামনে একটা টুলে বসে মূর্তিমান যমের মতো একটা লোক তন্দ্রাবেশে ঢুলছে। বাবলু বলল—এই ঘরে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে, যা পাহারা দিচ্ছে এই শয়তানটা।

বাবলু এদিক সেদিকে টর্চের আলো ফেলতেই এক জায়গায় দেখতে পেল একটা ভাঙা দরজার খিল পড়ে আছে। সেটা চকিতে তুলে নিয়েই লোকটার মাথায় সজোরে বসিয়ে দিল এক ঘা।

লোকটা 'ওঁক' করে মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দ তুলেই লুটিয়ে পড়ল রক্তাপ্লুত অবস্থায়। বাবলু তার ওপর আর এক ঘা দিতেই জ্ঞান হারিয়ে স্থির হয়ে গেল সে।

এ ঘরটাও শিকল দেয়া ছিল।

শিকল খুলে ভেতরে ঢুকতেই ওরা দেখতে পেল ঘরের মধ্যে জীর্ণ শয্যায় আধশোয়া হয়ে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। ঘরে একটি ছোট্ট চিমনি-লণ্ঠন জ্বলছে।

ভদ্রলোক এদের দেখেই যেন চমকে উঠলেন—পালাও, পালাও তোমরা এখান থেকে।

বাবলু বলল—আপনি কি দীপঙ্কর বোস?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আমিই দীপঙ্কর বোস। কিন্তু তোমরা আমাকে কি করে চিনলে?

—আপনি সিগারেটের কৌটোয় চিঠি লিখে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। সে চিঠি তোমরা পেয়েছ নাকি?

—পেয়েছি, এবং সেই চিঠি পেয়েই আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি।

—তোমরা কি পাঁচজন আছ?

—হ্যাঁ। আপনি কি করে জানলেন?

—আমাকে বন্ধু বলেছে।

—বন্ধু? বন্ধু কে?

—সে তোমাদেরই মতো একটি ছেলে। এদের দলে একজন সন্ন্যাসী আছে, সন্ন্যাসী ঠিক নয়, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে থাকে, সে করে কি মাঝে মাঝে দূরে গিয়ে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের ভুলিয়ে ভালিয়ে চুরি করে নিয়ে আসে। তারপর ছেলেকে ফিরিয়ে দেবার নাম করে তার বাপের কাছ থেকে মোটা টাকা চায়। টাকা হাতে পেলে ছেলেকে ফেরৎ পাঠায়। না পেলে তাকে মেরে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেয়। এই ছেলেটিও সেই রকম একটি ছেলে। ওরই সাহায্যে চিঠি লিখে আমি ওর হাত দিয়ে গঙ্গার জলে কৌটোটা ভাসিয়ে দিয়েছি।

বাবলু বলল—এবার বুঝতে পেরেছি এতক্ষণ অলক্ষ্য হতে কে আমাদের সাহায্য করেছিল। ঐ বন্ধুই নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ। সে তোমাদের পালিয়ে যাবার সুবিধে করতে চাইছিল। কিন্তু চারদিকে এত কড়া নজর যে সে কিছুতেই তোমাদের কাছে যেতে পারছিল না। তবু অলক্ষ্য থেকে যেটুকু করবার সে করেছে।

—কিন্তু আপনি এখানে কি করে এলেন?

—আমার ছেলেকে এরা চুরি করে এনেছে, এবং আমার কাছে এরা এক লাখ টাকা দাবি করেছে। সে টাকা আমি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এদের অন্য জায়গার অস্থায়ী ঘাঁটিতে এদেরই নির্দেশমতো যাই। তারপর ছেলেকে সেখানে আগে দাবি করে তারপর টাকা দেব, এই কথা বলতে ওরা আমাকে এখানে এনে বন্দী করে রেখেছে, এবং প্রতিদিন অকথ্য অত্যাচার করছে।

বিলু বলল—আপনার ছেলে কোথায়?

—বন্ধু জানে। আমি এখানকার কিছুই জানি না। বন্ধু এদের কয়েকজনকে একটু বশ করে ফেলেছে। তাই এখানকার অনেক কিছুই সে জানতে পেরেছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এর বাইরে যেতে পারেনি সে। কেন না এর ভেতরে যেমন তেমন, বাইরেই পাহারা বেশী।

বাবলু বলল—আচ্ছা আপনি যে লিখেছিলেন গঙ্গার ধারের সুড়ঙ্গের কথা, তা সেটা কোন্ দিকে?

বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল বছর চোদ্দ পনেরোর একটি হাফ প্যান্ট পরা ছেলে ছুটে ঘরে এসে ঢুকল।

দীপঙ্করবাবু বললেন—এই তো বন্ধু।

বন্ধু বলল—ও! তোমরা এখানে এসে গেছ?

বাবলু বলল—হ্যাঁ।

বন্ধু বলল—একেবারে পাঁচ পাঁচজনে এদের খপ্পরে পড়লে কি করে?

বাবলু বলল—যেমন করেই হোক পড়েছি। কিন্তু এখান থেকে কি করে পালাই বলত ?

—এখান থেকে পালাবার কোন পথই নেই। থাকলে আমরাই কবে পালাতাম।

বিলু বলল—কিন্তু তুমি এদের কি করে বশ করলে ভাই ?

—সে অনেক কৌশলে। এদের খাওয়া দাওয়ায় আমার মন ওঠে না বলে আমি এদের বলেছি, তোমাদের এখানে চাকরের মতো খেটে সব কাজ করে দেব। পালাবার চেষ্টা করব না। বিনিময়ে ভালো করে পেট ভরে খেতে দিতে হবে। ওরা রাজী হলে আমি মন দিয়ে ওদের কাজ করে দিই। ওরা আমাকে বিশ্বাস করে, তাই।

বাবলু বলল—আচ্ছা, গঙ্গার দিকে যাবার সুড়ঙ্গটা কোন্‌খানে ?

বন্ধু বলল—এই ঘরের বাঁ দিকের রাস্তাটাই সেই সুড়ঙ্গ। কিন্তু সে জেনে লাভ কি ভাই ?

—আমাদের যে কোন একজন জলপথে পালাবে।

বন্ধু বলল—খবরদার! অমন কাজটি কর না। গঙ্গার মাঝি মাল্লাদের ভেতরেও এদের লোক অনেক আছে। আশপাশের গ্রামের লোকও কেউ কেউ দলে আছে এদের। আর সাঁতার কেটে যে পালাবে সেও সম্ভব নয়। এখানকার জলের কারেন্ট খুব।

বাবলু বলল—তুমি আমাদের চেনো না বন্ধু, তাই একথা বলছ। এরই ভেতর দিয়ে আমরা পালাব। প্রথমে ডুব সাঁতারে গঙ্গার ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে যতটা পারি যাব। তারপর গঙ্গার পাড় ধরে হেঁটে হেঁটে গিয়ে কাছের কোন শহরে অথবা যেমন করেই হোক কলকাতায় চলে যাবো। আর, একবার যদি বেরোতে পারি তারপর দেখবে কি অবস্থা করি এদের।

বন্ধু বলল—পারবে ? পারবে ভাই যেতে ?

—নিশ্চই পারব।

—তাহলে চল। এখনই উপযুক্ত সময়। গঙ্গায় এখন ভাঁটা পড়েছে। চলে এস। কে যাবে ?

ভোম্বল বলল—আমি। আমি যাব। আমাদের দলে প্রত্যেকের চেয়ে সাঁতারে আমিই বেশী ওস্তাদ।

—তাহলে এস।

বন্ধুর সঙ্গে ভোম্বল সুড়ঙ্গ পথে চলে এসে টুপ করে গঙ্গার জলে ডুব দিল। তারপর রাতের অন্ধকারে মাছের মতো সাঁতার কেটে, কখনো ডুবে কখনো ভেসে, অনেক দূর চলে এল।

বেশ কিছুদূর আসার পর মাঠ পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠল ভোম্বল। ভাগ্যক্রমে সেখানে একটা পেট্রল পাম্প ছিল এবং কলকাতাগামী একটা মাল বোঝাই লরী ডিজেল নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ভোম্বল চুপি চুপি পিছন দিক দিয়ে সেই লরীতে উঠে লরীর মাথায় শুয়ে রইল।

মালবাহী লরী দ্রুতগতিতে ছুটে চলল কলকাতার দিকে।

ভোম্বল চলে যাবার পরই বাবলুরা করল কি, বন্ধুর সঙ্গে দীপঙ্করবাবুর ছেলেকে উদ্ধার করতে চলল। দীপঙ্করবাবু নিজেও চললেন। ঘরের সামনে যে লোকটার মাথায় ঘা মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল বাবলুরা, সেই লোকটাকে সকলে মিলে চ্যাংদোলা করে ঘরে ঢুকিয়ে শিকল দিয়ে দিল।

তারপর সবাই চলল বন্ধুর সঙ্গে দীপঙ্করবাবুর ছেলেকে উদ্ধার করতে।

ওরা সন্তর্পণে মা কালীর মূর্তির পিছনে এসে দাঁড়াল। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ থেকে সবাই পা টিপে টিপে সামনের দিকে এগোতে লাগল।

মিত্তিরবাবুর হাত থেকে লণ্ঠনটা ছিটকে গেল।

বন্ধুর হাতে তখন লম্বা একটা শনের দড়ি। বাবলু বলল—দড়ি কি করবে?

বন্ধু বলল—এই দড়িটার কেরামতি সময়কালেই দেখতে পাবে।

ওরা আস্তে আস্তে সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠল। সেই পুরানো জায়গা। সেখানে বন্ধু ওদের টর্চ দিয়ে সাহায্য করেছিল। তারপর সেই ঘরের আলমারিটার কাছে এল। যেখানে বাবলুরা বন্দী হয়েছিল প্রথমে।

বন্ধু বলল—আলমারিটা আর একটু সরাও।

সবাই মিলে ধরাধরি করে সরাল সেটাকে।

বন্ধু বলল—টর্চটা আমাকে দাও এবার।

বাবলু টর্চটা ওর হাতে দিয়ে দিল।

বন্ধু টর্চের আলো নীচে ফেলতেই ওরা দেখতে পেল নীচের মেঝেয় একটা আংটাওয়ালা কাঠের পাল্লা রয়েছে।

ওরা সবাই মিলে সেটাকে টেনে তুলতেই দেখতে পেল একটা সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে ক্রমশঃ।

বন্ধু বলল—এর ভেতরেই ওরা আছে।

সত্যিকারের নরক বলতে যদি কিছু থাকে তো তা হল এই জায়গাটা। বাবলুরা নামতে যাচ্ছিল। বন্ধু বলল—না। শুধু দীপঙ্করবাবু যান এবং যারা যারা এর ভেতরে আছে তাদের সবাইকে নিয়ে আসুন।

দীপঙ্করবাবু সবে নীচে নেমেছেন এমন সময় দেখা গেল ওপর দরজায় সিঁড়ির মুখে সাক্ষাৎ যমের মতো মিত্তিরবাবু এসে দাঁড়ালেন। মিত্তির-বাবুর হাতে আলো ছিল। তিনি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা বাবলুদের দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন—আরে! ছেলেমেয়েগুলো সব গেল কোথায়? বলেই এদিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

বন্ধু বলল—সেরেছে! গোলমাল বাধ্রবে এবার।

বাবলু বলল—কুছ পরোয়া নেই। বলেই তার পায়ের জুতোটা খুলে মিত্তিরবাবুর হাতের লণ্ঠনের কাঁচ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে বসল। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ।

লণ্ঠন ছিটকে চলে গেল হাত থেকে। অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে গেলেন মিত্তিরবাবু। বাবলু আর বিলু তখন এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিত্তিরবাবুকে ধরাশায়ি করে একেবারে বুকের ওপর চেপে বসল। ততক্ষণে দীপঙ্করবাবু তাঁর নিজের ছেলে এবং আরো জনা দশেক ছেলেমেয়েকে উদ্ধার করে উঠে এসেছেন ওপরে।

টর্চের আলোয় সব দেখেই তো চক্ষুস্থির। মিত্তিরবাবুর কণ্ঠনালির কাছে বিলু ছুরিটা এমনভাবে ধরে আছে যে টুঁ শব্দটি করতে পারছেন না মিত্তিরবাবু।

বন্ধু বলল—এইবার তোমরা আমার দড়ির ম্যাজিক দেখো। এই বলে দীপঙ্করবাবুর সাহায্যে

বেঁধে করে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল মিত্তির-বাবুকে।

বাবলু বলল—ব্যস। এরপর যা যা করতে হবে তা আমিই করব।

বিলু বলল—কি করবি?

—প্রথমে দীপঙ্করবাবু এই ঘরের পিছন দিকে চলে যান।

বাবলুর কথামতো তাই হল। দীপঙ্করবাবু পিছনদিকে চলে গেলেন। বাবলু আর বিলু মিত্তিরবাবুকে নিয়ে দীপঙ্করবাবুর কাছে রেখে এল।

বাচ্চু-বিচ্ছু রইল এক কোণে নিরাপদ ব্যবধানে।

বাবলু বলল—আমার কাছে খানিকটা দড়ি আছে। এই দড়ি নিয়ে বাইরে যাবার সিঁড়ির মুখে একদিকে বাচ্চু-বিচ্ছু এবং অপরদিকে আমি বসে থাকব। বাইরে থেকে কেউ ভেতরে ঢুকলেই দড়িটা এমনভাবে তুলে ধরব যে ব্যাটা যাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে জখম হয়। বিলু তুই করবি কি তোর ছুরিটা নিয়ে অন্ধকারে মিশে থাকবি, আর টর্চের আলোয় যে যাবে তাকে পথ দেখাবি। আর এখানে দীপঙ্করবাবু মিত্তিরবাবুর পেটের কাছে একটা ছুরি ধরে বসে থাকবে, যাতে আমাদের কথামতো বুলি আওড়াতে মিত্তিরবাবু বাধ্য হন।

দীপঙ্করবাবু বলল—মিত্তিরবাবুকে কি বলতে হবে?

—উনি শুধু বলবেন, 'আমরা আক্রান্ত। তাড়াতাড়ি গোপন সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়।' অর্থাৎ কি না নরকের ঘরে যাদের ধরে এনে পুরে রেখেছিলেন তাইতেই ঢুকে পড়তে বলবেন। আর বন্ধু, তুমি করবে কি ওপরের সিঁড়ির বাইরে গিয়ে এদের দলের সবাইকে বলবে যে বিশেষ দরকারে মিত্তিরবাবু এখুনি ডেকেছে। যাও। দেরি কর না।

বাবলুর কথামতো সবাই যে যার ভূমিকায় অবতীর্ণ হল।

বন্ধু একেবারে বাইরে গিয়ে খবর দিয়েই চলে এল। বন্ধু এলে বাবলু বলল—বন্ধু! দড়ির একদিকে বাচ্চু-বিচ্ছু ধরেছে আর অপর দিকটা বরং তুমি ধর। তোমরা তো পিস্তল চালাতে পারবে না। আমি পারি। আমি পিস্তল নিয়ে থাকি। বেগতিক দেখলেই গুলি চালাব।

বন্ধু তাড়াতাড়ি দড়ি ধরে অন্ধকারে সিঁড়িতে নামার মুখে বসে রইল। ওদিকের দড়ি শক্ত করে ধরে রইল বাচ্চু আর বিচ্ছু।

বাবলু এক কোণে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর বিলু করল কি, অন্ধকারে মেঝের ওপর বসে টর্চটা জ্বেলে একেবারে নরকের গর্তের নীচে নামার সিঁড়ির মুখে ধরে রইল। যাতে একমাত্র এই অন্ধকারে সিঁড়ির পথটুকু ছাড়া শয়তানরা আর কিছু দেখতে না পায়। ওদিক থেকে দীপঙ্করবাবুর ছুরির ফলার ভয়ে মিত্তিরবাবুও সমানে বলে চললেন—আমরা আক্রান্ত। তোমরা লুকিয়ে পড়ো।

বন্ধুর মুখে খবর পেয়েই শয়তানগুলো আসতে শুরু করল এক এক করে। তারপরই শুরু হল ম্যাজিকের খেলা। বাইরে থেকে এসে অন্ধকার সিঁড়িতে নামার মুখেই দড়িতে পা জড়িয়ে অমন বিশাল বিশাল বপুগুলো গাছ পড়ার মতো পড়তে লাগল ধুপধাপ করে। অতটা উঁচু থেকে পড়ে প্রত্যেকেই বেশ রীতিমতো জখম হল। কারো হাত ভাঙল, কারো পা ভাঙল, কারো দাঁত মুখ থেঁতো হল। কারো বা মাথা ফাটল। তারপর অতি কষ্টে উঠে মিত্তিরবাবুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে আলো লক্ষ্য করে হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নরকের ঘরে। মিত্তিরবাবু যে কোথায় বসে আদেশ দিচ্ছেন তাও কেউ

দেখতে পেল না। আর কে যে আলো দেখাচ্ছে তাও কেউ জানতে পারল না। শুধু বিপদ শুনে আদেশ মতো কাজ করে গেল সকলে।

বাবলুর পিস্তল থেকে একটি গুলিও খরচা করতে হল না অযথা, সব ক'টাকে ভেতরে ঢুকিয়ে মিত্তিরবাবুকেও ধাক্কা মেরে ভেতরে ফেলে দিল ওরা। তারপর ওপরের পাল্লাটা চাপা দিয়ে একটা ছিটকিনি ছিল, সেটা এঁটে দিল।

বাবলু বন্ধুকে বলল—আর কেউ আছে নাকি?

বন্ধু বলল—না। আর কেউ নেই। এখন আমরা একেবারে মুক্ত।

দীপঙ্করবাবু বাবলু আর বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত অন্যান্য ছেলে-মেয়েরাও তখন বাবলুকে ধন্যবাদ জানাল। বিশেষ করে বিচ্ছুর মুখে ওরা যখন শুনল যে, ওরা আসলে শুকতারার বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা, তখন তো আনন্দের অবধি রইল না ওদের।

বাবলু বলল—এস। এখন আমরা সর্বাগ্রে আমাদের পঞ্চুকে খুঁজে বার করি।

এতক্ষণে সবাই বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বাবলু ডাকল—পঞ্চু? এই পঞ্চু?

অনেক দূর থেকে অমনি পঞ্চুর গলা ভেসে এল—ভৌ-উ-উ।

বাবলু আবার ডাকল।

পঞ্চু আবার উত্তর দিল। কিন্তু বাবলুর ডাকে কাছে এগিয়ে এল না সে।

বাবলু বলল—এগিয়ে গিয়ে দেখতে হচ্ছে তো তাহলে ব্যাপারটা কি? নিশ্চয়ই পঞ্চু কোন বিপদে পড়েছে।

ওরা সবাই টর্চের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলল। কিছুদূর গিয়েই ওরা দেখতে পেল একজন লোক একটা তালগাছের খানিক উঠে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। পঞ্চুর জন্য নীচে নামতে পারছে না, আর পঞ্চু তাকে দেখে গর্র গর্র করছে।

বাবলু বলল—আরে, এখানে এক ব্যাটা রয়ে গেছে যে?

বন্ধু লোকটাকে ভালো করে দেখে বলল—না, এ এদের লোক নয়।

লোকটা ওদের দেখে বলল—এই কুকুরটাকে দয়া করে তাড়ান বাবুরা। আমি এইখানে আটকে আছি।

বাবলু বলল—কে তুই?

—আজ্ঞে আমি লোকো দুলে। তালের রস চুরি করতে এসেছিলুম। আমি কথা দিচ্ছি বাবু আর কখনো এখানে আসব না।

বাবলু হেসে পঞ্চুকে ডেকে নিতেই লোকটা গাছ থেকে নেমে দে দৌড়।

ওরা আবার মন্দিরে ফিরে এল।

আকাশ তখন ফর্সা হয়েছে।

ভালো করে সকাল হবার আগেই দেখা গেল দশ বারোটা লঞ্চ বোঝাই পুলিস নিয়ে ভোম্বল এসে হাজির।

দলকে দল সবাই ধরা পড়ল।

লক্ষ লক্ষ টাকার সোনার মূর্তিগুলোও উদ্ধার করা হল।

দারোগাবাবু বললেন—সত্যি। তোমরা আবার একটা মস্ত কাজ করে ফেললে। তোমরা যাতে মোটামুটি রকমের পুরস্কার একটা পাও আমি সেই ব্যবস্থা করছি এবার।

ওরা সবাই বিজয় গর্বে লঞ্চে উঠল। গঙ্গার জল তোলপাড় করে ছুটে চলল পুলিসের লঞ্চ।

সিংহের কবল থেকে ভালুকের কোলে

অলক ঘোষ

খিদিরপুর ডক থেকেই মথুরা সিংকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল পুলিস।

এ-রকমটাই যে হবে, তা কুইবেক থেকে জাহাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেয়েছিলেন ডাক্তার। ছায়ার মত গোয়েন্দা ঘুরেছে তাঁর পিছনে। ভাগ্যিস জাহাজখানা ছিল এক ফরাসী কোম্পানির, তা নইলে বেড়ি পরে খোলের মধ্যেই বসে বসে দরিয়া পেরুতে হত মথুরাকে। ফরাসী কাপ্তেন ইংরেজ পুলিসের আবদার এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন—"আমার জাহাজ হল আমার রাজ্য, এর উপর তোমাদের ওয়ারেণ্টের কোন এক্তিয়ার নেই—"

টের পেয়েছিলেন ডাক্তার মথুরা সিং। চিন্তিত হয়েছিলেন, কিন্তু ভয় পাননি। গ্যাঁট হয়ে বসেছিলেন এমনি একখানা ভাব দেখিয়ে যেন কিছুই বুঝতে পারেননি। ডিনার টেবিলে ইংরেজ গোয়েন্দার পাশে বসেই খেতে হয়েছে এক এক দিন, ভ্রূক্ষেপও করেননি মথুরা। রাতে কেবিনের দরোজার ওপিঠে খসখস আওয়াজ শুনে জোর গলাতেই হেঁকে উঠেছেন এক এক সময়—"জুতো জোড়াটা রয়েছে ওখানে, মাড়িয়ে দিসনি বাপু!"

যা হোক, শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসে ওরা ধরল মথুরা সিংকে। ইংরেজের মুলুক, এখানে আর রাজদ্রোহী মথুরাকে বাঁচায় কে! রাজদ্রোহী! সেই রাজাটা যে কী অধিকারে ভারতের রাজা, মথুরা সিংয়ের মত হাজার হাজার ভারতসন্তান সেই মোটা কথাটাই বুঝতে পারেনি কোনদিন।

মথুরাকে নিয়ে প্রথমে ওরা গেল প্রেসিডেন্সি জেলে। জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট এলেন সেই জেলখানাতেই। দুই চার কথা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন বন্দীকে, তারপর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সই করে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। সেই কাগজের বলে মথুরাকে পাঞ্জাবে পাঠানো চলবে এখন, পুলিস হেফাজতে কয়েদী হিসাবে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ওঁর নাম উঠেছিল। বিচার চলার সময় ওঁকে হাজির করা যায়নি, যদিও নালিশ ছিল ওঁর

বিরুদ্ধে ভয়ংকর। মানসুরাঁর ডাকাতিতে যে সব বোমা ব্যবহার হয়েছিল, তা নাকি ভারত ত্যাগের আগে উনিই গড়ে রেখে গিয়েছিলেন।

তখন মথুরার বিচার হতে পারেনি, এখন হবে। বাংলার পুলিস তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে হাত-কড়ি পরিয়ে। নিয়ে যাবে লাহোর পর্যন্ত, ঢুকিয়ে দেবে সেখানকার সেণ্ট্রাল জেলে, যেখানে একবার ঢুকলে রাজদ্রোহ মামলার আসামীরা কদাচিৎ জ্যান্ত অবস্থায় বেরুতে পারে।

একবার সে জেলে ঢুকলে আর জ্যান্ত বেরুতে হবে না যে, একথা মথুরাই কি আর না জানেন? তিনি পালাবার ফিকির খুঁজতে লাগলেন। এত দীর্ঘ পথ! এই দুই হাজার মাইল পাড়ি দেবার সময় কোথাও এমন সুযোগ কি আসবে না, যাতে এই ছয়টা পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালানো যায়?

এ-রকম পরিস্থিতি আসবে, তা জানা ছিল মথুরার। জাহাজে বসেই তিনি মতলব ঠিক করে রেখেছিলেন অন্ততঃ চার ছয় রকম মতলব—যে ধরা পড়ার পরে কীভাবে তিনি পুলিসের হাত থেকে পালাবেন। মাথায় আছে সে সব। অবস্থা বুঝে তার মধ্যে সবচেয়ে লাগসই মতলবটা এবার মাথা থেকে বার করলেন মথুরা।

প্রাতঃকৃত্যের সময় একবার করে হাতকড়ি খুলে দেয় প্রহরীরা। শৌচাগারের জানালা নেই, দরোজায় প্রহরী থাকে, সুতরাং চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ারও সুবিধে নেই বন্দীর। কাজেই পুলিসপুঙ্গবদের মাথায় কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই ও-নিয়ে!

হাতকড়ি খুলে মথুরাকে ওরা ঢুকিয়ে দিয়েছে শৌচাগারে।

গলার ভিতরে আঙুল দিয়ে তার ভিতরকার থলি থেকে সুকৌশলে টেনে বার করলেন মথুরা সিং, ক্ষুদে একটা মসৃণ গোল কৌটা। পুরানো কয়েদীরা অনেকে গলার ভিতর এরকম থলি তৈরি করে রাখে টাকা লুকিয়ে রাখবার জন্য। বিদ্যেটা মথুরা শিখে নিয়েছিলেন তাদের কাছেই। কিন্তু নিজের গলায় টাকা তিনি রাখেননি, রেখেছিলেন বোমা। অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ বোমার। মানুষ মরেও না ওর আঘাতে, কিন্তু একটা শব্দ হয় প্রচণ্ড, আর ধোঁয়া হয় প্রচুর।

শৌচ সেরে সেই বোমাটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন মথুরা। প্রহরী হাতকড়ি পরাবার জন্য হাত তুলতেই সেই বোমা ছুঁড়ে মারলেন তার মুখে। একটা প্রলয় আওয়াজ, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন গাড়ি, পুলিসরা লাফিয়ে হটে দাঁড়াল প্রাণের ভয়ে।

তারপর তারা যখন বন্দুক বাগিয়ে এগিয়ে এল আবার, তাদের আসামা ভেগেছে। চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েই উধাও হয়েছে মথুরা সিং।

তারপরে সাবধানে পায়ে পায়ে জমিন পরখ করতে করতে মথুরা সিং এগিয়ে চললেন পাঞ্জাবের পানে। গোয়ালিয়রে, দিল্লীতে লুকিয়ে থাকতে হল দীর্ঘ দিন। গোয়েন্দারা হন্যে হয়ে ফিরছে। বিশ হাজার টাকা মূল্য ধার্য হয়েছে মথুরা সিংয়ের মস্তকের। সে লোভ বড় লোভ। দেশে এমন লোক বিস্তর আছে, সুবিধা পেলে যারা দ্বিধামাত্র করবে না ওঁকে ধরিয়ে দিয়ে মবলগ টাকাটা পকেটস্থ করতে।

তবু পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন মথুরা সিং। ট্রেনে চড়তে সাহস পান না। ছদ্মবেশ ধারণের প্রবল অন্তরায় তাঁর দাড়ি। শিখের সন্তান, দাড়ি কাটবেন কেমন করে? কানাডায় অনেক ভাল চাকরি মথুরার ফসকে গিয়েছে ঐ আবক্ষলম্বিত ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রুর জন্য। পেটে রুটি না থাকলেও দাড়ির বিনিময়ে চাকরি নিতে রাজী হয়নি যে লোক, সে আজ পুলিসের ভয়ে দাড়ি কাটবে?

ট্রেনে ওঠা হয় না, ট্রাঙ্ক রোডে দিবালোকে হাঁটতে ভরসা হয় না। রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে পথ চলা বা সদাশয় কোন বয়েল গাড়িওলার দাক্ষিণ্যে খানিকটা পথ সেখানে শুয়ে বসে আরাম করা। এই ভাবে চললেন মথুরা সিং শামুকের গতিতে।

ইতিমধ্যে মোটাবাবুর কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছে। মথুরা সিং সেদিন ভোর রাত্রে স্নান সেরে নিচ্ছেন বিতাই নদীর জলে, কূলে এসে দাঁড়াল একটা কালো ছায়া। মথুরা সিং প্রমাদ বুঝলেন। ধরা না পড়তে হলে তাঁকে এখন স্রোতে গা ভাসিয়ে নিঃশব্দে সরে যেতে হয় এখান থেকে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সেটা ত কোনমতেই সম্ভব নয়। কারণ তাঁর সব কাপড়-জামা কূলে পড়ে আছে, পয়সাকড়ি সমেত। গামছা পরে তিনি জলে নেমেছিলেন। এই ভোরে অন্ধকার নদীকূলে পুলিস এসে হানা দেবে, তা ভাবেননি।

গামছা পরে ভেসে যাওয়া চলে। কিন্তু ভেসেই ত যাওয়া চলবে না অনন্তকাল। উঠবার সময় কী উপায় হবে? উঠবার পরেই বা পরবেন কী? ঘোর সমস্যা!

"উঠুন ডাক্তার, ভোর হয়ে আসে যে!"—মৃদু তর্জন শোনা গেল কূল থেকে।

এরকম স্বরে কি পুলিসের লোক কথা কইবে? কিংবা এমনও হতে পারে যে পুলিসেরই লোক ছলনা করতে এসেছে বন্ধু সেজে!

"কে আপনি?"—কূলের কাছাকাছি এসেও কূলে ওঠেন না মথুরা সিং।

"কী মুশকিল! আপনিও ধরা পড়ে যাবেন, আমিও যাব—বিতাইয়ের দুই কূলে পুলিস মোতায়েন হয়েছে। আসুন শীগগির, আমি মোটাবাবু, সতীন্দর চন্দর—শুনেছেন নাম?"

"না, শুনিনি"—গজগজ করে উঠলেন মথুরা সিং। যে লোক তিন বছর পরে দেশে ফিরেছে, অনেক কিছুই হালফিলের জিনিস তার না শোনা রয়ে গিয়েছে—

"বলি, রাসবিহারী বোস নামটা শুনেছেন ত?" —বিরক্তির সঙ্গে কৌতুক মেশানো মোটাবাবুর কণ্ঠে।

"তা আর শুনিনি? কিন্তু মাফ করবেন, রাসবিহারী এ সময়ে বিতাই নদীর কূলে হাজির হবেন মথুরা সিংয়ের প্রাতঃস্নান দেখবার জন্য, এটা আমার কাছে আঠারো আনা অবিশ্বাস্য ঠেকছে।"

রাসবিহারীর ধৈর্যচ্যুতি হল—"বলি, ধরা পড়ার ভয়টা কি এতই বেশী যে তার জন্য এত তর্কাতর্কি করতে হবে? আমি ত পুলিসের গা ঘেঁষে চলি—"

আর বলতে হল না। অভিমানে আঘাত লাগল মথুরা সিংয়ের। উঠে এসে তিনি পায়জামায় পা ঢুকিয়ে দিলেন—"না, সত্যি কথাই বলেছেন আপনি। ধরা পড়ার ভয়ে জলে দাঁড়িয়ে থাকাও এক রকম ভীরুতা। এখন আপনি যদি সত্যিই বোস ওরফে মোটাবাবু ওরফে সতিন্দর চন্দর হন, আসুন, কোলাকুলি করি। আর যদি তা না হন, তবে ডাকুন আপনার পুলিস, এক ত আর আপনি আমাকে পাকড়াতে পারবেন না! রিভলবার থাকলেও না—"

কোলাকুলি অন্তে মোটাবাবু মথুরা সিংকে নিয়ে শেঠ বেনোয়ারির গোলায় উঠলেন। এখানে হর্তুকির বাঁধি কারবার চলে শেঠজীর। গুদাম ঘরে খাটিয়া পেতে শেঠজী দুই অতিথিকে আশ্রয় দিলেন এক দিনের জন্য।

অনেক কথাই হল দুই কর্মবীরে।

"আপনি পাঞ্জাবে বসে থাকলে পাঞ্জাবের বা ভারতের কোন উপকার নেই আপাততঃ"—বললেন মোটাবাবু—"এখানে যা করবার, অন্য লোকেই তা

গবর্নরের কাছে মথুরা সিং ব্যক্ত করলেন তাঁর আসল উদ্দেশ্য। [পৃষ্ঠা ২৬৩

করছে। যে কাজ করবার সাধ্য অন্য কারুরও নেই, তেমন কিছু যদি আমি বাতলে দিই, আপনি করবেন কি? যাবেন রাশিয়ায়?"

"দরকার যদি মনে করেন ত যাব না কেন?"—নিঃসংকোচে জবাব দিলেন মথুরা সিং।

মোটাবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—"আছে দরকার, খুব বেশী রকমই দরকার আছে। ইংরেজে রুশে সম্প্রীতি নেই, তা দুনিয়ার সবাই জানে। এ-অবস্থায় ভারতবাসী যদি ইংরেজকে তাড়াবার জন্য অস্ত্রসাহায্য চায়, রুশ তা দেবে না কেন?"

মথুরা বললেন—"দেয়নি কেন এতদিন? শত্রুর যে শত্রু, পরোক্ষভাবে সে মিত্রই। এ-হিসাবে আমরা মিত্র রুশের। রুশের ত যেচে কামান বন্দুক দেবার কথা আমাদের—"

"হয়ত দিত, চাওয়া হয়নি"—বললেন মোটা-বাবু—"আপনি যাবেন চাইতে? বিপদ অবশ্যই আছে। প্রাণ যেতে পারে আপনার। নানাভাবেই পারে—"

"সেটাও কি একটা ভাববার কথা?"—হেসে উত্তর দিলেন মথুরা সিং।

সন্ধ্যার পরে দুটো ঘোড়া এল হর্তুকীর গোলায়। একটায় মথুরা সিংকে দিয়ে অন্যটাতে মোটাবাবু চড়লেন। গেঁয়ো পথটুকু দুইজনে অতিক্রম করলেন পাশাপাশি। তারপর ট্রাঙ্ক রোডে উঠে হাতে হাত মেলালেন দুইজনে। তারপরে—"তাহলে বিদায়, বন্দে মাতরম্"—বললেন মোটাবাবু।

মথুরা সিংও বললেন—"বন্দে মাতরম্। বিদায় তাহলে—"

সেই চিরবিদায়। রাসবিহারীর সাথে আর মথুরা সিংয়ের দেখা হয়নি জীবনে।

দুইজন দুইদিকে ঘোড়া ছোটালেন। রাসবিহারী দিল্লীর দিকে, মথুরা লাহোরের পানে। লাহোরে তাঁর কাজ নেই কিছু, তবু মাতৃভূমি, জন্মস্থান—এসব একবার না দেখে কি চলে যাওয়া যায়? হয়ত এই যাওয়াই জন্মের মত যাওয়া!

দেখাশোনায় দিন পনেরো কাটল। তারপর মথুরা সিং পাড়ি জমালেন কাবুলের পথে। রাসবিহারীর নির্দেশ এসেছে বিপ্লবী সংঘের কাছে, মথুরা সিংয়ের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছে তারা। কিন্তু কাবুল সীমান্ত পেরুবার সঙ্গে সঙ্গে জাতভাইদের সান্নিধ্যে সে উষ্ণস্পর্শ হারাতে হল মথুরাকে। বিজন পাহাড়িয়া পথে একা তিনি, নিছক একা।

হোন একা, মিত্র যেমন নেই, শত্রুও নেই এখানে। কাবুল নিরপেক্ষ দেশ, হয়ত একটু দরদই আছে তার স্বাধীনতার সৈনিক ভারতীয়দের উপরে। কোন কাবুলী কোন প্রশ্ন করেনি কোন-

দিন মথুরা সিংকে। দরাজ হাতে সব-রকম সাহায্য এগিয়ে দিয়েছে প্রয়োজনের মুহূর্তে।

কাবুল নির্বিঘ্নে পেরিয়ে অবশেষে তাসখন্দে পৌঁছুলেন মথুরা সিং। এইখানে রুশ পুলিস এসে পরিচয় চাইল তাঁর। ছাড়পত্র? না, সে-সব কিছু নেই। —"আমি রাজনৈতিক কারণে ইংরেজ রাজ্য থেকে পলাতক, আশ্রয়প্রার্থী রুশসম্রাটের। এই মাত্রই আমার পরিচয়—"

পুলিস তাঁকে নিয়ে গেল তাসখন্দের গবর্নরের কাছে। সেইখানে মথুরা সিং ব্যক্ত করলেন তাঁর আসল উদ্দেশ্য। জ্বালাময়ী ভাষায় বর্ণনা করলেন—পরাধীন ভারতের দুঃখ দৈন্য গ্লানি ও নৈরাশ্য। উপসংহার করলেন এই নিবেদন দিয়ে—"মহামান্য জার কি একটুও সহানুভূতি দেখাবেন না পরপদানত ভারতবাসীদের উপরে? অন্য কিছু নয়, কিছু অস্ত্র আমাদের দিন! কিছু অস্ত্র! বাহুবলে ভারতীয়েরা কারও চাইতে কম নয়, আমাদের অভাব শুধু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের—"

গবর্নর হাসিমুখে শুনলেন সব কথা। সে-হাসির ভিতরে কি একটু পরিহাস মেশানো ছিল?

তিনি পরামর্শ দিলেন—"একটা আবেদন পত্র লিখে ফেলুন জারের নামে। সেটা আমায় হাতে দিন। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি রাজধানীতে সম্রাটের কাছে। তাতে আপনার দরখাস্ত নিরাপদে পৌঁছুবে, তাড়াতাড়ি পৌঁছুবে। নিজে গিয়ে যদি দিতে চান—কত দিন লাগবে আপনার সেখানে যেতে, সম্রাট দরবারে ঘেঁষতেই পারবেন কিনা—ঠিক কী! এখান থেকে দরখাস্ত দিন, সম্রাট্ যদি তারপর ডেকে পাঠান, তখন যাবেন।"

মথুরা সিং বোকা নন। তিনি বুঝলেন যে গবর্নর তাঁকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে আর বেশীদূর এগুতে দিতে রাজী নন। বাধ্য হয়ে তিনি একটা আবেদন পত্র লিখে গবর্নরের হাতে দিলেন।"

সেটা জারের কাছে পৌঁছেছিল কিনা সন্দেহ। মাস দুই বাদে গবর্নর মথুরা সিংকে বন্দী করে ভারতে পাঠিয়ে দিলেন ইংরেজ সরকারের হাতে সমর্পণ করার জন্য। কাকে কাকের মাংস খায় না। এক সাম্রাজ্যবাদী অন্য রাজ্যে বিদ্রোহী প্রজার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রশ্রয় দিতে পারে না। সিংহে ভালুকে রেষারেষি যতই থাকুক, মানুষকে উভয়েই শত্রু বিবেচনা করে।

লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে মথুরা সিংয়ের ফাঁসি হয়ে গেল ইংরেজ বিচারকের আদেশে। জারের কাছে লিখিত আবেদন পত্রখানাই দাখিল হল তাঁর রাজদ্রোহের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে।

কুতুর পালোয়ানী

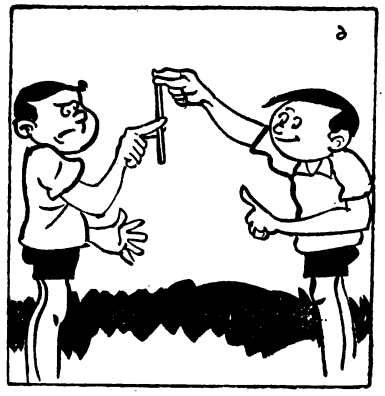

কাতু পেন্সিলটার একদিক ধরে কুতুকে বললে, কুতু, তুই ডান হাতটা সোজা করে বাড়িয়ে বুড়ো আঙুল আর তর্জনীটা পেন্সিলের দুদিকে রাখ। দেখিস আঙুল যেন পেন্সিলের গায়ে না ছোঁয়। আমি পেন্সিলটা ছেড়ে দিলেই তুই ধরে ফেলবি।

কুতু বললে, ভারী তো শক্ত কাজ। এই বলে কুতু কাতুর কথামত পেন্সিলের দুদিকে আঙুল রেখে অপেক্ষা করতে লাগল কাতু কখন পেন্সিল ছাড়বে।

কাতু পেন্সিল ছেড়েছিল, কিন্তু কুতু কি সেটা ধরতে পেরেছিল? তোমরা চেষ্টা করে দেখে বল ত।

(না পারলে ২৬৯ পৃষ্ঠায় দেখ)

দিলীপ দাস

এক মাস পরে-আন্নুর গ্রামে ভূতে পাওয়া মেয়েটির কুঁড়ের সামনে নিমগাছের ডালটা হঠাৎ ভীষণ নড়ে উঠল
পালাও ভূত খেপেছে
মেয়েটা ঘরের মধ্যে হঠাৎ উঠে বসেছে।
আঃ শরীরটা খুব ভাল লাগছে।
এদিকে নিমগাছের ডালটাও সশব্দে ভেঙে পড়ল।
ভূতটা তাহলে মুক্তি পেল!
?!
?!
সেদিন গয়াধামে পিণ্ডি দিয়ে ক্ষুদিরাম রাতে ধর্মশালায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছেন।
এবার আমি তোমার ঘরে যাব।
আমরা বড় গরীব, কি করে সেবা করবো

যেদিন ক্ষুদিরাম গয়ায় পিণ্ডি দিচ্ছিলেন, সেদিন ক্ষুদিরামের স্ত্রী চন্দ্রমণি যুগিদের শিবমন্দিরের সামনে প্রতিবাসিনী ধনীকামারনীর সঙ্গে কথা বলছিলেন –

এক বছর পর কামারপুকুরে ক্ষুদিরামের বাড়ী থেকে শাঁখের শব্দ আসছে –

তখন কলকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা –

(ক্রমশঃ)

যাদুর গোপন রহস্য

যোগীযাদুকর মৃণাল রায়

রাত তিনটে নাগাদ ফিরে এসে আমার দিকে এটাচিটা ছুঁড়ে দিয়ে গোপালবাবু বেশ রাগের সঙ্গেই আমাকে বললেন, "এই নিন আপনার এটাচি। আমি চললাম।"

এত রাত্তিরে সত্যি সত্যি তাঁকে দরজার দিকে যেতে দেখে ছুটে গিয়ে হাতটা চেপে ধরলুম। বললুম, "কি ছেলেমানুষী করছেন? কাল শো, আর আজ এখন মাথা গরম করলে চলে?"

আমার হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ধপ্ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়ে প্রায় কেঁদেই ফেললেন গোপালবাবু। বললেন, "দেখুন মৃণাল-বাবু, স্টেজে ম্যাজিক দেখাতে যত কষ্ট হয় হোক। তাই বলে…"

গোপালবাবুর অবস্থা দেখে মায়াও হচ্ছিল, আর বেশ হাসিও পাচ্ছিল। চেয়ারটার একপাশে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক ঝুঁকছিলেন। অনেকটা পথ হেঁটে আসার ক্লান্তির ছাপ রয়েছে সারা শরীরে। হাঁটু পর্যন্ত ধুলো ভর্তি। চুলগুলো উশকোখুশকো। ঘামে ভিজে পাঞ্জাবিটা গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে। বিশ্রামের জন্য পাশের ঘরে গোপালবাবুকে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে শুয়ে পড়লুম। ধকল কি আমাকেও কম সহ্য করতে হয়েছিল? এক একজন অতি উৎসাহীর কৌতূহল মেটাতে আমাদের মাঝে মাঝে এমন বিপদের মুখোমুখি হতে হয়, যার থেকে পরিত্রাণ পেতে পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে হয়।

গোপালবাবু আজ আমাদের দলে নেই। কিন্তু তবুও কোন বিপদ পড়লেই প্রথমেই তাঁর কথাই বেশী করে মনে পড়ে। আর আজ পত্রিকার জন্য লিখতে বসে মনে হচ্ছে, আমি এক মহাবিপদে পড়েছি। সেজন্যই গোপালবাবুর কথাটাই মনে পড়ল। আজ আপনাদের এমনই একটা বিপদের কথা বলব যার থেকে আমাকে অতি কষ্টে উদ্ধার করার পর তিনি আমার দল ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন।

আজ থেকে প্রায় ১৫।১৬ বছর আগের কথা। সবে ম্যাজিক দেখাতে বাংলার বাইরে যেতে শুরু করেছি। গিয়েছিলাম গুজরাটের একটা শহরে। ক'দিন পরই শহরের একটা হলে 'শো' আরম্ভ করব, অনুমতি চাইতে গেছি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। ম্যাজিসিয়ান শুনেই ভদ্রলোক আমাকে খুব খাতির করে বসালেন। তারপর নানা আলোচনার পর হঠাৎ তিনি বলে বসলেন, "আচ্ছা মিঃ রয়, যাদু দেখিয়ে তো বেড়ান। পারবেন মিঞাগাম স্টেশনে "ফ্রন্ট-ইয়ার মেল"কে থামিয়ে দিতে?

ভদ্রলোকের কথা শুনে প্রথমটায় আমি তো বেশ খানিকটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। মনে মনে বললুম, যাদুকরদের এঁরা ভাবেনটা কী! ফ্রন্ট-ইয়ার মেল ভারতবর্ষের অন্যতম দ্রুতগামী ট্রেন। বরোদা থেকে সুরাটের মধ্যে কোন স্টেশনেই থামে না। রাত দেড়টা নাগাদ মিঞাগাম স্টেশনের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ওটা চলে যায়। ওটাকে আমি থামাব কি করে?

আমরা লোক ঠকিয়ে খাই। নার্ভটাকে আমাদের সব সময় একটু শক্ত রাখতে হয়। ঘাবড়ে গেছি এমন ভাব মুখে প্রকাশ না করে একটু হেসে বললাম, "এ এমন কি কঠিন কাজ! ইচ্ছে করলেই থামাতে পারি।" কথাটা হাসতে হাসতে বলেছিলুম বটে, কিন্তু ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে এসেছিল। কিন্তু মনে মনে ভাবলুম যে, "ম্যাজিসিয়ানরা অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে—সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা যতদিন জিইয়ে রাখা যায়, ততই পসার জমে ভালো। এইখানেই তো সাধারণের সঙ্গে যাদুকরের তফাৎ।

গোপালবাবুও সেদিন আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি মুখে হ্যাঁ বললেও কাজটা যে এত সহজ বা সম্ভব নয়, তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি একটা

লাইনের ওপর বসে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে জল ছেটাতে লাগলুম। [পৃষ্ঠা ২৬৮

চাল চাললেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "একটা বাজি হয়ে যাক। মৃণালবাবু যদি ট্রেন থামাতে না পারেন তবে উনি আপনাদের পাঁচ হাজার টাকা দেবেন। আর যদি পারেন তাহলে আপনাকে মাত্র পাঁচশো টাকা দিতে হবে। রাজী?"

আমার দিকের অঙ্কটা বেশী রাখার অর্থ ভদ্রলোককে এটাই বোঝানো যে, যদি ট্রেন থামাতে নাই পারবে তবে এতগুলো টাকা এরা দিতে রাজী হচ্ছে কেন? কিন্তু ভদ্রলোকও কম যান না। ট্রেন থামানো যে একেবারেই অসম্ভব তা তিনি জানতেন। তাই গোপালবাবুর প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নিয়ে বললেন, "আমি রাজী।"

ঠিক হল পরদিন রাতেই আমি ট্রেনখানা থামাব।

পরদিন রাত একটা নাগাদ ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি করে আমি মিঞাগাম স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। খবর পেয়ে স্থানীয় কয়েকজন যাদুকরও স্টেশনে হাজির হলেন। স্থানীয় কিছু লোকও অতি রাত্রে স্টেশনে এসে ভিড় জমাল অসম্ভকে কি করে সম্ভব করি দেখতে। আমি কিন্তু সেদিন বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলুম। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল যে, এই বুঝি ফিট হয়ে গেলুম। সঙ্গে করে এক কমণ্ডলু ভর্তি জল নিয়ে গিয়েছিলুম। লাইনের ওপর বসে নানারকম মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে জল ছেটাতে লাগলুম চারিদিকে। যাদুকরের দলসহ কৌতূহলী জনতা অবাক্ হয়ে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছিল। সময় ক্রমেই এগিয়ে আসছে। দূর থেকে "ফ্রন্ট-ইয়ার মেল"এর হেডলাইটের আলোটা অন্ধকার ভেদ করে চারিদিক আলোকিত করতে করতে এগিয়ে আসছে। জনতা উদ্‌গ্রীব। আমার মনে হচ্ছে বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে। ট্রেনের আলো ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। আমি লাইন ছেড়ে সরে এসে বেশ জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলুম। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারিদিকে একটা গুঞ্জন উঠল।

বেশ ভয়ের সঙ্গে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ভারতের অন্যতম ক্ষিপ্রগতি "ফ্রন্ট-ইয়ার মেল" আমার যাদুবলে সিকি মাইল দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জনতা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। ম্যাজিস্ট্রেট আর যাদুকররা হতভম্ব। অসম্ভব কি করে সম্ভব হল! ভয়ে ভাবনায় শরীরটা আমার অবশ হয়ে গিয়েছিল। মাথাটা তাই হঠাৎ কেমন যেন ঘুরে উঠল। আমি ধপ্ করে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালাম। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তার গাড়ি করে আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেছিলেন। মিনিট দশেক পরে জ্ঞান ফিরতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "বাবাস, You are really a genious". তারপর আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে পাঁচশো টাকার চেক দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

গোপালবাবুর কল্যাণে আমি আর একবার সসম্মানে বিপদের হাত থেকে রেহাই পেলাম।

না, আর নয়, আপনাদের অনেকক্ষণ ঝুলিয়ে রেখেছি। খালি খালি গোপালবাবুকে কেন টেনে নিয়ে আসছি, তাই ভাবছেন তো আপনারা? ভাবছেন যে, ট্রেন তো যাদুবলেই থেমেছে, তা এর পেছনে গোপালবাবুর কি হাত থাকতে পারে!

হ্যাঁ, সত্যিই গোপালবাবুরও হাত ছিল এই ট্রেন থামানোর পেছনে। পরদিন সকালে কয়েকজন যাদুকরও আমার কাছে ছুটে এসেছিলেন। বলেছিলেন, "হাউ ইট ওয়াজ পসিবল, মিঃ রায়। ইটস নাথিং বাট মিরাক্যাল।"

ব্যাপার আসলে সত্যিই কিছুই নয়। আগেই তো বলেছি, ম্যাজিক মানেই লোক ঠকানো। ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ থেকে বাড়ি ফিরতেই ভাবতে শুরু করেছিলুম যে, কীভাবে ট্রেনটাকে থামানো যায়। ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি মাথায় এল। একটা এটাচির মধ্যে কিছু ফাইলপত্তর আর কাগজ-পত্ত দিয়ে গোপালবাবুকে নিয়ে বরোদায় চলে যেতে বললুম। আর বললুম যে, ওখান থেকে 'ফ্রন্ট-ইয়ার মেল'এ উঠে তিনি যেন একটা জানালা ঘেঁষে বসেন। ট্রেনটা যখন মিঞাগাম স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে বিশ্বামিত্র নদীর ওপরের পুলটা দিয়ে আসবে, তখন তিনি হাঁটুর ওপর এটাচিটা রেখে এমনভাবে ওটা খুলবেন যাতে সুটকেসটা জানলা দিয়ে বাইরে পড়ে যায়, আর পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চেন টানেন। কারণ এত দ্রুতগামী ট্রেনকে চেন টেনে থামাতে হলে একটু আগে থেকে না টানলে থামতে থামতে চলে আসছে মিঞাগাম স্টেশনের কাছাকাছি। আর

তিনি ঐ ফাঁকে ট্রেন থেকে নেমে পেছন দিকে হাঁটতে থাকবেন, যেন পড়ে যাওয়া কাগজপত্তর-গুলোই খুঁজতে যাচ্ছেন। গার্ড সাহেবও যখন যাত্রীদের মুখে সব শুনবে যে, তার কাগজপত্র সহ সুটকেস সত্যিই পড়ে গেছে, তখন তার বলারও কিছু থাকবে না।

পাঠকদের আর একটু অবাক্ করছি। আমার অজ্ঞান হবার ব্যাপারটাও কিন্তু সম্পূর্ণ ধোঁকা। আমি ঠিক ঐ সময় জ্ঞান হারাবার ভান না করলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হয়ত ট্রেন থামার আসল কারণ তদন্ত করার জন্য থেমে যাওয়া ট্রেনটার দিকে গাড়ি ছোটাতেন, আর তাহলে আমার চালাকিও ধরা পড়ে যেত। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়তে সবাই আমাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর এই ফাঁকে ট্রেন মিঞাগাম স্টেশন পেরিয়ে চলে গিয়েছিল।

গোপালবাবু সেদিন অত রাত্রে একা একা অতটা পথ হেঁটে রেললাইনের পাশ দিয়ে এসে এটাচীটা ছুঁড়ে দিয়ে রাগের সঙ্গে অথচ কাঁদো কাঁদো স্বরে কথা বলছিলেন দেখে হেসেছিলাম, কিন্তু আজ ভাবি উনি না থাকলে আমি কী গুজরাটের বক্স অফিস ঐরকমভাবে জয় করতে পারতাম সে সময়?

অবিস্মরণীয় মণিমুক্তা

রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

দৃঢ়চেতা

রোজ রোজ নতুন নতুন জামা কাপড়, কোট প্যাণ্ট পরে স্কুলে যায় মধু। আজ ত চকচকে কালো রঙের দামী কোট প্যাণ্ট পরে চলেছে। স্কুলের আজ বাৎসরিক পরীক্ষা। সহপাঠী বন্ধু ভূদেব বললো, 'দামী দামী কোট প্যাণ্ট পরে তুই তো পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিস, যদি পরীক্ষায় ফেল করিস্! ও সবের মান থাকবে?'

মধু বললো, 'ধ্যেৎ, ফেল করবো কেন রে? আমি ফার্স্ট হবো, দেখে নিস। ক্লাসের যদি একটাও ছেলে পাস করতে না পারে, না পারুক, আমি পাস করবোই। বুঝলি?' সুদৃঢ় উত্তর মধুর।

ভূদেব বাঁকা ভাবে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলো মধুর এ অহংকার ভেঙে যাবে নিশ্চয়ই! কিন্তু না, কখনোও তা নয়। দৃঢ়চেতা মধু যখন যা বলে, তাই করে।

মধু ক্লাসে ফার্স্ট হল। মধু প্রতি পরীক্ষাতেই ফার্স্ট হয়। পরীক্ষা দেবার আগেই ফার্স্ট হবে বলা এবং সত্যি সত্যিই ফার্স্ট হওয়া দৃঢ়চেতা এই মধুই হচ্ছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। যশোহর জেলার (বর্তমান বাঙলাদেশ) সাগরদাড়ী গ্রামে এঁর জন্ম। কপোতাক্ষী নদীর তীরে সে গ্রাম।

---

২৬৩ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর

কুতুর পালোয়ানী—কুতু না পেরে চলে গিয়েছিল।

দুটো আলোর ফুটকি

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

"এরকম জনশ্রুতি অনেক দেশেই আছে যে, সাপের চোখের দৃষ্টি থেকে একটা চৌম্বক-শক্তি বিচ্ছুরিত হয়। সে শক্তির আকর্ষণের ভিতর এসে পড়ে যে দুর্ভাগ্য, প্রাণপণে চেষ্টা করলেও সে আর বেরিয়ে যেতে পারে না সে আকর্ষণের মৃত্যুফাঁদ থেকে। অনিবার্যভাবেই এগিয়ে যেতে বাধ্য হয় সাপের দিকে। শেষ পর্যন্ত তারই কামড়ে প্রাণ হারায়।"

আরাম করে সোফায় শুয়ে একখানা বই পড়ছে হার্কার ব্রেটন। বইখানা মরিস্টার রচিত "মার্ভেল্‌স্ অব সায়েন্স" (বিজ্ঞানের বিস্ময়)। ঐ বাক্যটি পড়তে গিয়ে সে নিজের মনেই হেসে উঠল। নিজের মনেই বলল—"বিস্ময়ের বিষয় শুধু একটাই দেখছি এতে। সেটা এই যে, এ যুগের অতি অজ্ঞেয়াও যে কুসংস্কারে বিশ্বাস করবে না, সেকালের বিজ্ঞেয়াও বিশ্বাস করতেন তাতে।"

নিজের এই নীরব মন্তব্য থেকে নানা চিন্তার উদ্ভব হতে থাকল একের পর এক। কারণ ব্রেটন লোকটি একটু বেশী মাত্রায় চিন্তাশীল ব্যক্তি। চিন্তা-মগ্ন অবস্থাতেই হাতের বইখানা ধীরে ধীরে নেমে এল কোলের উপরে, দৃষ্টি কিন্তু যেদিকে নিবদ্ধ ছিল, রয়ে গেল সেই দিকেই। আর বইয়ের আড়াল ঘুচে যেতেই সেই দৃষ্টিতে ধরা পড়ল একটা কী-যেন-কী।

কী? বিছানার নীচে ঐ জায়গাটাতে একটু আলো-আঁধারির মত। সেইখান থেকে দুটো আলোকবিন্দু ফুটে বেরুচ্ছে। খুবই সূক্ষ্ম সে বিন্দু দুটো। দুটোর মাঝে ইঞ্চি খানিক ফাঁক। মাথার উপরে গ্যাসের নল রয়েছে, তাই থেকেই ঠিকরে এসে থাকবে হয়ত আলোর ফুটকি দুটো। ও নিয়ে আর মাথা ঘামাল না ব্রেটন। আবার কোল থেকে বই তুলে নিল পড়বার জন্য। আড়ালে পড়ে গেল ফুটকি দুটো আবার।

কিন্তু মিনিট খানিকের ভিতরই আবার সে বই

নামিয়ে রাখল কোলে, সমুখপানে তাকাল এক অবচেতন আবেগের বশে। সে আবেগটা কৌতূহলের, না অসাচ্ছন্দ্যের, না অন্য কিছুর, তা বিশ্লেষণ করে দেখবার কথা মনে হয়নি তার। "কেন তাকাচ্ছ"—এ প্রশ্ন কেউ করলে সে তখন উত্তরই দিতে পারত না তার।

হ্যাঁ, সমুখপানে ঐ যে পূর্বস্থানেই রয়েছে আলোর সেই ফুটকি দুটি। আগের চেয়েও একটু উজ্জ্বল যেন। একটা সবুজ আভা তা থেকে বেরুচ্ছে যেন। এ আভাটা সে আগে দেখেনি। তা ছাড়া ফুটকি দুটো একটু নড়ে বসেছে নাকি? দুই এক ইঞ্চির মত এগিয়ে এসেছে? তবু এখনও খাটের তলায় আলো-আঁধারিতেই ওরা রয়েছে, বোঝা যাচ্ছে না জিনিসটা কী। আবার ব্রেটন পড়তে শুরু করল।

না পড়লেই হত ভাল।

পড়তে পড়তেই এমন কিছু সে পেল বইয়ের পাতায়, একটা নতুন চিন্তা তার মগজে খেলে গেল বিদ্যুৎ-চমকের মত। সে চমক এমনি প্রখর, সে আর নিশ্চল বসে থাকতে পারল না আগের মত। খাড়া হয়ে বসল সোফার পাশে বই রেখে। বইখানা রইল না সেখানে, পড়ে গেল মেঝেতে ধপাস করে। ব্রেটন কুঁজো হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। খাটের তলার সেই আলো-আঁধারির দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঐ যে আলোকবিন্দু দুটো। আর তারা এখন তত সূক্ষ্ম নেই, তারা জ্বলজ্বল করছে আগের চেয়েও বেশী। আর উদাসীন থাকলে চলে না। কী ও দুটো আলো, দেখতেই হবে। ব্রেটন এখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকাচ্ছে ওদের দিকে।

কী সর্বনাশ! ও যে একটা সাপ! মস্ত সাপ একটা! খাটের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, মাথাটা সেই কুণ্ডলীর উপরে রেখে। ঐ আলোর বিন্দু দুটো হল ওরই দুটো চোখ!

ওর ফণাটা কী চওড়া! কী ভয়াবহ ঐ ফণা! ফণাটা যে সোজা ব্রেটনের দিকেই প্রসারিত! ওর হাঁ-করা চোয়াল, ওর দরাজ কপাল, ওর হিংস্র দৃষ্টি, সব কিছুই যেন ব্রেটনকে যমালয়ে পাঠাবার দৃঢ় সংকল্পেরই পরিচায়ক!

আধুনিক মহানগরী এই সানফ্রানসিস্কো। তার অভিজাত পল্লীতে ধনীগৃহের শয়নকক্ষে সাপের আবির্ভাব! সচরাচর ঘটে না এ জিনিস। ঘটে না বলেই একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে সে আবির্ভাব কেমন করে সম্ভব হল, তারই ব্যাখ্যা।

হার্কার ব্রেটন হালে ফিরে এসেছে নিজের দেশে, বহু দূরের প্রায়-অজানা সব দেশ পর্যটন করে। উঁচু স্তরের বড় ঘরে তার জন্ম। বয়স সবে পঁয়ত্রিশ, বিয়ে এখনও করেনি। লেখাপড়া দস্তুরমত করেছে। তা কাজে লাগাবার কিছুমাত্র মতলব নেই। খেলাধুলো, বেড়ানো-টেড়ানো ছাড়া অন্য কোন বাবদে মেহনত করতে একান্ত অরাজী। পয়সা যথেষ্ট, সমাজের অন্যতম সিংহপুরুষ এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী।

এহেন ব্রেটন, দেশ-ভ্রমণ সমাপ্ত করে ফিরে এল যখন, কোথায় উঠবে, তাই নিয়ে পড়ে গেল সমস্যায়। সানফ্রান্সিস্কোর সেরা হোটেল যে ক্যাসল্ হোটেল, সেখানকার আরাম-বিরামও পর্যাপ্ত মনে হল না ওর বিবেচনায়। বিদেশে বিদেশে কষ্ট পাওয়া গিয়েছে ঢের, সে ক্ষতির ষোল-আনা পূরণ করতে হলে ওঠা দরকার ক্যাসল হোটেলের চাইতেও সরেস কোন জায়গায়।

এই সমস্যার সমাধান কী করে হয়, ভেবে ভেবে ব্রেটন যখন দিশেহারা, তখন তার বৈজ্ঞানিক বন্ধু ডক্টর ডুরিং এসে বললেন—"তুমি আমার বাড়িতে এসে থাক।"

বেঁচে গেল ব্রেটন। ডুরিং তার অনেক কালের

বন্ধু, অপরিমিত ধনী। আগে আগে মাঝে মাঝে তার বাড়িতে দুই চার দিন করে বাসও করেছে ব্রেটন। দেখেছে যে, ডুরিংয়ের জীবন-যাত্রার মান প্রাচ্যের অনেক রাজা বাদশারও ধারণার বাইরে। সে দ্বিরুক্তি মাত্র না করে ডুরিংয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠল।

বাড়ি মানে একটা প্রাসাদ। যে কালে তৈরি হয়েছিল, তখন ও-পল্লীটা সবচেয়ে শৌখিন অঞ্চল বলেই গণ্য হত। ইদানীং অবশ্য নতুন নতুন মহল্লা গজিয়ে উঠেছে এমন এমন, যাদের তুলনায় ডুরিংয়ের পাড়াটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে খানিকটা। কিন্তু তা হলেও আভ্যন্তরীণ শ্রীছাঁদ বা ডিনার টেবিলের রাজকীয় সমৃদ্ধি তো আর লুপ্ত হয়নি! ব্রেটন বন্ধুকেও ধন্যবাদ দিল, দিল নিজের বরাতের জোরকেও।

বৈজ্ঞানিক মনিষ্যি ডাক্তার ডুরিং। বিজ্ঞানের যে শাখায় তাঁর গবেষণা চলছে আজ এক যুগ ধরে, তা হল সরীসৃপ-যুগের প্রাণিতত্ত্ব। গবেষণার জন্য নতুন একটা মহলই তিনি যোগ করে নিয়েছেন পুরানো প্রাসাদের সঙ্গে। লাগোয়া হলেও আলাদা। সেখানে থাকে নানা দেশ, নানা জঙ্গল থেকে সংগৃহীত নানাজাতীয় সরীসৃপ—কতক নিরীহ, কতক বা হিংস্র।

প্রাসাদের এই নতুন মহলে আছে ঐ সরীসৃপদের বাসস্থান, যথাসম্ভব তাদের পছন্দমত প্রাকৃতিক পরিবেশে। আর আছে একটি যাদুঘর, যাতে অজগর পাইথন থেকে শুরু করে ডাইনোসরদেরও কঙ্কাল সংরক্ষিত হয়েছে প্রচুর সংখ্যায়। শুধু হাড়-পাঞ্জর সম্বল কঙ্কালও আছে যেমন, তেমনি তুলো-ভরা চামড়া-ঢাকা কঙ্কাল, জ্যান্ত প্রাণীটার হুবহু দেহাবশেষও আছে অনেক।

বলা বাহুল্য, এই সরীসৃপ মহলে যাওয়া-আসা ডুরিংয়ের স্ত্রী-কন্যা-পুত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাদের অপরাধ তারা ঐ সব জীবকে, মৃতই হোক বা জীবিতই হোক, ভালবাসতে তো পারেই না ডুরিংয়ের মত, উলটে ভয় পায় দস্তুরমত। তাদের এই ভাবে নির্বাসিত করাতে তারাও বেঁচে গিয়েছে, ডুরিং নিজেও স্বস্তি পেয়েছেন।

ব্রেটনের অবশ্য এ মহলে যাওয়ার পক্ষে বাধা কিছু নেই, কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছা তার একবারের বেশী দুইবার হয়নি। সে পুরানো মহলেই নিজের ঘর জুড়ে বসে থাকে। তিনবেলা খাওয়ার সময় খাওয়ার ঘরে যায়, ডুরিং পরিবারের সঙ্গে যা কিছু মেলামেশা তার, তা ঐ সময়টাতেই শুরু এবং শেষ হয়।

দিনের বাকী সময়টা সে হয় ঘরে বসে পড়ে, আর না হয় তো বাইরে বাইরে ঘোরে শহরের নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে অল্পবিস্তর অংশগ্রহণ করে করে।

কিন্তু যে কথা হচ্ছিল, ফিরে আসা যাক তাতেই আবার।

খাটের নীচেকার জিনিসটা যে কুণ্ডলী-পাকান সাপ, এটা আবিষ্কার করার সঙ্গেই ভয়ে, নয়, ঘৃণায় তার গা গুলিয়ে উঠল। বিজ্ঞানের কেতাবে সাপের কথা পড়া হল এক জিনিস, নিজের শোবার ঘরে মুখোমুখি তাকে দেখতে পাওয়া হল অন্য। পৃথিবীর লক্ষ-রকম প্রাণীর মধ্যে সাপকেই সে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে। এত নোংরা জীব ওরা! একাধারে নোংরা, কুটিল ও হিংস্র!

হ্যাঁ, সাপটাকে দেখে ঘৃণায় গা গুলিয়ে উঠেছিল ব্রেটনের, তা ঠিক। অন্য রকম সাড়া তার মনে জাগেনি কিছু। প্রথমটায় সে ভাবল ঘণ্টাটা বাজিয়ে দেওয়া যাক, চাকরেরা কেউ এসে ওটাকে তাড়াবার বা ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কাজ সে করল না। ঘণ্টার দড়িটা হাতের নাগালেই ঝুলছে, হাত তুললেই

টান দেওয়া যায়, কিন্তু হাত সে তুলল না। সাপ তাড়াবার জন্য চাকর ডাকা? চাকরটা নিশ্চয় সন্দেহ করবে যে সাহেব ভয় পেয়েছেন সাপ দেখে। সত্যি সত্যি যে ভয়ের লেশমাত্র ব্রেটন অনুভব করছে না, তা কে জানবে?

ভয়? মোটেই না। প্রাসাদ-কক্ষে সাপ, পরিস্থিতিটার হাস্যকর অসঙ্গতির কথাই বার বার মনে জাগছে ব্রেটনের। ভয় নয়।

চেয়ারে বসে যতদূর দেখা যাচ্ছে ওকে, তাতে ত মনে হয় এ জাতের সাপ আগে কখনো দেখেনি ব্রেটন। লম্বা যে কতটা, তা সঠিক বুঝবার উপায় ত নেই, আন্দাজ পনেরো ষোল ফুট হতে পারে। ধড়ের সবচেয়ে স্থূল যে অংশটা তা ত মনে হয় ব্রেটনের বাহুর সমানই স্থূল হবে। বিপজ্জনক কিনা, তাও ত বুঝবার উপায় নেই। বিষধর? অজগর, যা চেপে ধরে পিষে মারে? ডুরিং এক পলক দেখেই বলতে পারেন নিশ্চয়, ব্রেটন পারে না।

ডুরিং! তাঁরই সরীসৃপ মহলের বাসিন্দা যে এটি, কোন ফিকিরে চুপিসাড়ে নিজের ডেরা থেকে বেরিয়ে এইখানে উঠে এসেছে হাওয়া বদলের জন্য, তাতে সন্দেহ নেই। ডুরিংয়ের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ওদের সম্বন্ধে। বিশেষ করে যখন অতিথি থাকে বাড়িতে।

কিন্তু সে বোঝাপড়া পরে করা যাবে ডুরিংয়ের সাথে, আপাততঃ বিবেচ্য হল এই যে, সাপটা বিপজ্জনক যদি নাও হয়, বিরক্তিকর ত বটেই! এখানে ও অবাঞ্ছিত, অবান্তর, অনধিকারী। এখানে এসে ঢোকাই চরম ধৃষ্টতা ওর। ওর নিশ্বাসবায়ু এই ঘরের হাওয়ায় মিশছে, এবং সেই হাওয়াই আবার প্রশ্বাসের সঙ্গে ঢুকছে ব্রেটনের দেহে—এ চিন্তাটাই গ্লানির।

চিন্তা থেকে বিবেচনা, তা থেকে সিদ্ধান্ত, তা

ব্রেটন খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

থেকে উদ্যম। ব্রেটন খাড়া হয়ে দাঁড়াল। সাপটা সামনেই রয়েছে, ওর দিকে পিছন ফেরা সঙ্গত হবে না। ও যদি পিছু নেয়, ব্রেটন তা টের পাওয়ার আগেই ও ছোবল মেরে বসবে। সাপ দৌড়োয় অতি দ্রুত, এমনি একটা কথা শোনা আছে ব্রেটনের। না, পিছন ফেরা নিরাপদ নয়, শত্রুর দিকে দু'চক্ষু রেখেই সাবধানে পিছনে হাঁটতে হবে। এভাবে হেঁটেও সে দোর পর্যন্ত পৌঁছোতে পারবে বলে বিশ্বাস আছে তার। সাপও যদি এগুতে থাকে তাকে পিছু হাটতে দেখে, তখন?

দেয়ালে ছবি আছে ভারী ভারী ফ্রেমে। শিকলসুদ্ধ একখানা খুলে নিয়ে সাপের মাথায় মারা

যেতে পারবে অনায়াসে। ব্রেটন লম্বা লোক, হাত তুললে ধরতে পারবে শিকল।

তা হলে হাটাই যাক পিছুপানে। লজ্জার কিছু নেই তাতে। পরাক্রান্তদের সমুখ থেকে অপসৃত হওয়ার এটাই রীতি। পরাক্রান্ত যথা রাজাবাদশা, যথা বাঘ ভুজঙ্গ। লজ্জাকর নয়, অথচ নিরাপদ। অতএব হাটো ব্রেটন, পিছনে হাটো।

উঃ, সাপের দু'টো চোখ জ্বলছে দেখ! রোষ আর নৃশংসতা ঠিকরে পড়ছে যেন ঐ দু'টো আলোর ফুটকি থেকে!

পিছু হাটবার জন্য ও ডান পা মাটি থেকে তুলেছে সবে, নিজের আচরণে নিজেরই লজ্জা করতে লাগল ব্রেটনের। লোকে জানে ব্রেটন সাহসী লোক। সে সাহস কি মিথ্যে দম্ভই মাত্র? তার পালানোর সাক্ষী কেউ নেই বলেই কি সে পালিয়ে যাবে? তা যদি যায়, সে সাহসের মূল্য কী?

পা উঁচু করে তোলাই আছে, চেয়ারের পিঠে ডান হাত রেখে সে ভারসাম্য রক্ষা করছে। নিজের মনেই সে বলে উঠল—"কী সব আজগুবি কথাই ভাবছি! আমি কি এতই ভীরু যে লোকে আমায় ভীতু ভাববে? এই ভয়ে কাতর হব?"

পিছুপানে হাটবেই ব্রেটন তা হলে! ডান পা উঁচু করাই রয়েছে। আর একটু উপরে তুলল হাঁটু ভাঁজ করে। তারপর পা-খানাকে নামিয়ে দিল মেজেতে। কী তাজ্জব! পা ত পিছন পানে পড়ল না! পড়ল যে সমুখ পানে! বাঁ পা থেকে একটুখানি এগিয়ে! এক ইঞ্চি এগিয়ে হলেও এগুনোই ত সেটা! পিছোনো 'ত নয়! বাঁ পা দিয়ে পিছোবার চেষ্টাও একই ভাবে ব্যর্থ হল। বাঁ পা পড়ল এসে ডান পা'র এক ইঞ্চি সমুখে।

চেয়ারের পিঠে হাত তখনো রয়েছে ব্রেটনের। চেয়ারটাকেই যেন সে আঁকড়ে ধরে আছে। কেন এমন হচ্ছে? কেন সে করতে চাইছে এক-রকম, করে বসছে ঠিক তার উলটোটা? কে তাকে করাচ্ছে এরকমটা? একটা আবছা আতঙ্ক ধোঁয়ার মত ঢুকছে তার মগজে। সাপের চোখ দুটো এখন ঠিক দুটো বিজলি টর্চের মত জ্বলছে। তা থেকে যেন অসংখ্য অগ্নিশলাকা ছুটে এসে বিঁধে যাচ্ছে ব্রেটনের সর্বাঙ্গে!

মানুষটার মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ। আবার সে পা ফেলল। এবারও সমুখে। আবার ফেলল, এবারও তাই। সে এগিয়ে যাচ্ছে, চেয়ারখানাকে টেনে টেনেই নিয়ে চলেছে। অবশেষে চেয়ার পড়ে গেল সশব্দে, মানুষটারও মুখ থেকে বেরুলো একটা গোঙানি। সাপ নড়ছে না, হিস-হিস শব্দও করছে না একটিবারও, কিন্তু তার চোখ দুটো জ্বলছে ঠিক দুটো সূর্যের মত। এমনি চোখ-ধাঁধানো তাদের আলো, যে আলোর পিছনে সাপের অত বড় কুণ্ডলী পাকানো ধড়টাই অদৃশ্য এখন।

আলোটা নিশ্চল হয়ে নেই। বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। বৃত্তগুলির পরিধিও ক্রমে বেড়ে চলেছে, তাদের বর্ণেও পরিবর্তন ঘটছে মুহুর্মুহু। রামধনুর সাত রং একটার পরে আর একটা খেলে যাচ্ছে ব্রেটনের সমুখে, লেহন করে যাচ্ছে তার চোখমুখ। ব্রেটনের মনে হল কোথায় যেন একটা ঢাক বাজছে ডুং—ডুং—ডুং—ডুং, আর সেই ডুং-ডুংয়ের ফাঁকে ফাঁকে এক সপ্তস্বরা বীণা যেন ঝঙ্কার দিয়ে চলেছে অনির্বচনীয় মাধুর্যে। এ সংগীত তার অপরিচিতও নয়। একদিন মিশরের মেমনন-মূর্তির সমুখে এই সংগীতই প্রতি-প্রত্যূষে বাজত। সে কি নীল নদের কূলে নলখাগড়ার ঝোপে দাঁড়িয়ে বহু শতাব্দীর ওপার থেকে আগত সেই সংগীতেরই রেশ শুনতে পাচ্ছে আজ?

সংগীত থেমে যাচ্ছে। ওদিকে রৌদ্রদীপ্ত এক মনোরম প্রান্তর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ব্রেটনের

চোখের সামনে। তার মাথার উপরে এক প্রদীপ্ত ইন্দ্রধনু, আর সেই ধনুর বেষ্টনিতে শত শত পল্লী ও নগর জনকোলাহলে মুখরিত। সহসা সেই ইন্দ্রধনু আবার রূপান্তরিত হল এক আকাশ-পৃথিবী-জোড়া মহাসর্পে, তার ফণার উপরে রত্নকিরীট, আর তার দুই চক্ষুতে এক করুণ দৃষ্টি।

ব্রেটন শিউরে উঠল, ও-দৃষ্টি সে আগেও একবার দেখেছে, অন্য একজনের চোখে। সে চোখ ছিল তার মুমূর্ষু মায়ের।

তারপর সমস্ত দৃশ্যটাই যেন আকাশে উঠে গেল অভিনয়ের সূচনায় রঙ্গমঞ্চের যবনিকার মত। শূন্য। শূন্যাকার মহাব্যোম চারিদিকে। কী যেন একটা কঠিন আঘাত লাগল ব্রেটনের মুখে এবং বুকে। সে হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়েছে মেঝেতে, নাকটা ভেঙ্গে গিয়েছে, ঠোঁট কেটে গিয়েছে, রক্তে মাখামাখি সমস্ত মুখ।

সমুখে সটান লম্বা হয়ে পড়ে যাওয়ায় দরুন ব্রেটনের মাথা এখন সাপের ফণা থেকে মাত্র এক গজের ভিতরে এসে গিয়েছে। আছাড়ের পরেই একটু আচ্ছন্ন ভাব এসে পড়েছিল তার দেহে এবং মনে। সেটা কেটে যেতে বেশীক্ষণ লাগল না। জ্ঞান ফিরে আসতেই শুরু হল এক বীভৎস ব্যাপার। মানুষটা উবুড় হয়েই পড়ে আছে কক্ষতলে, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে দেহের ঊর্ধ্বাংশটা উঁচু করে তুলতে চাইছে। মাথা পিছনে হেলানো, দুই পা লম্বা করে ছড়ানো। মুখের যেখানে যেখানে রক্ত নেই, সেখানে সেখানে চামড়া দেখাচ্ছে ছাই-রং, ঠোঁটে ফেনা গড়াচ্ছে। দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে সাপের চোখের উপরে নিবদ্ধ। উঠবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে হতভাগ্য, কোমর থেকে দেহের নিম্নাংশটাকে কিছুতেই টেনে তুলতে পারছে না। যত নড়ছে, তত এগিয়ে আসছে তিলে তিলে, এগিয়ে আসছে সাপের মুখের কাছে। আর কতটুকু তফাৎ? আর কতটুকু? সাপ এইবার ফণাটা নোয়ালেই ব্রেটনের মাথা নাগালের ভিতর পায়।

ব্রেটন ডান হাত উঁচু করে যেন সেই সুনিশ্চিত ছোবলকে রুখতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে পর পর কয়েকটা আর্ত চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল একেবারে।

সেই চিৎকার শুনে ডাক্তার ডুরিং আর তাঁর স্ত্রী ছুটে এলেন। দেখলেন এক বিভীষিকা। ব্রেটন উপুড় হয়ে পড়ে আছে, মৃত। মাথা আর দু'হাতের অর্ধেকটা পালঙ্কের নীচে ঢুকে রয়েছে। দেহটা টেনে বার করতেই একটা জিনিস চোখে পড়ল ডুরিংয়ের।

"এ জিনিসটা এখানে আনল কে?"—বলে সেটাকে টেনে এনে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে দিলেন ডুরিং। সে একটা তুলো-ভরা সাপ, তার সেই অগ্নিবর্ষী দুই চক্ষু, দুটি ক্ষুদে কাচের বোতাম মাত্র, জুতোর বোতাম।*

* মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রীয় সুখ্যাত কথাশিল্পী অ্যাম্‌ব্রোজ বিয়ার্স-এর "দ্য ম্যান অ্যাণ্ড দ্য স্নেক" অবলম্বনে।

কুতুর চ্যালেঞ্জ

কুতু একটা সূঁচ নিয়ে বললে, এটা কি জলে ভাসে? চেষ্টা করে দেখ ত। (না পারলে ২৭৫ পৃষ্ঠায় দেখ।)

খোদনের খ্যাতিলাভ

স্বপনবুড়ো

ইস্কুলের পড়া তৈরি করবে কি, খোদনের রাত দিন শুধু ওই এক চিন্তা—কি করে খ্যাতি লাভ করা যায়!

সারা কাগজে কত লোকের নাম ছাপা হয়, কত মানুষের কত ছবি ওঠে,

কত লোকের প্রশংসায় দলে দলে মানুষ পাগল হয়ে ওঠে—

কত অভিনেতার অভিনয় দেখে 'হল' ভর্তি লোক হাততালি দিয়ে পায়রা উড়িয়ে দেয়—কিন্তু আফসোসের কথা, খোদনের দিকে কারো নজর নেই!

আচ্ছা, তোমরাই বলো, খোদন কি একটা ক্যালনা লোক? ওকি শুধু একটা ফালতু বাঁশের টুকরো? রাশি রাশি লোকের খ্যাতির আড়ালে ওর কি কোনো মূল্যই নেই!

খোদন কি অজানাদের আড়ালে একেবারে হারিয়ে যাবে? খোদন যত ভাবে, তত আশে-পাশের লোকেদের ওপর চটে যায়, বিরক্ত হয়, আর দিনরাত অসোয়াস্তি অনুভব করে।

ওদের ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা পাঠ্যপুস্তকের কতকগুলি কথা 'আণ্ডার লাইন' করে দেন। কথাগুলি নাকি ভারী দামী। পরীক্ষায় আসতে পারে।

সেই রকম খোদনের নামটা রাতারাতি দামী হয়ে উঠতে পারে না? সবাইকার মুখে মুখে ফিরবে খোদনের নাম! সবাই হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে বলবে, হ্যাঁ, খোদন খ্যাতিলাভ করেছে বটে! সবাই তার নামটা নিয়ে লোফালোফি করছে!

এই ত কিছুদিন আগেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে ভারতের রবার নিয়ে কী রগড়া-রগড়ি! কাগজে-কাগজে নাম ছাপা হল! ফটোতে ফটোতে পাতা ভরতি হয়ে উঠল। রেডিওতে চললো নানা নামের ধারাবিবরণী।

একটা দিনের জন্যেও কি খোদনের নামটা সবাইকার জপমালা হয়ে উঠতে পারে না! খোদন কেবলি ভাবে, কিন্তু কোনো পথ খুঁজে পায় না!

ওর জন্মদিনে পিসেমশাই একটা সুন্দর ছুরি উপহার দিয়েছিল। একদিন সেইটে পকেটে নিয়ে খোদন ইস্কুলে গিয়ে হাজির হল। হঠাৎ তার মগজে বিদ্যুতের ঝিলিকের মত একটা বুদ্ধি খেলে গেল। এই ছুরি দিয়ে টেবিলে, চেয়ারে, ব্ল্যাকবোর্ডে নিজের নাম খোদাই করে রাখতে পারে! তা হলে রোজ সবাইকার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করবে ওর নাম।

যে কথা সেই কাজ !

টিফিনের ঘণ্টায় ছেলের দল যখন টিফিনের খাবার খেতে ব্যস্ত, সেই সময় খোদন তার নতুন ছুরি বাগিয়ে ধরে 'খোদন' নাম খোদাই করে ফেললে ডেস্কে, টেবিলে, চেয়ারে, ব্ল্যাক-বোর্ডে আর দরজায়।

সেদিন হয়তো বিশেষ কেউ লক্ষ্য করেনি তার হাতের কাজ ! পরদিন হেডমাস্টারমশায়ের ঘরে তার ডাক পড়ল।

হেডমাস্টারমশাই গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, তুমি কি অপারেশন করার ডাক্তার ? সব জায়গায় ছুরি চালিয়েছ ? ইস্কুলের সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য তোমায় দশ টাকা জরিমানা হল।

মাথা নীচু করে খোদন ফিরে এলো। নাঃ, খ্যাতিলাভের পথ মোটেই খোলসা নয়। নিশ্চয়ই ক্লাসের 'মনিটার'টা ওর নামে হেডমাস্টারের কাছে নালিশ জানিয়েছে। এখন এই দশটি টাকা সে কি করে যোগাড় করে ? একমাত্র ঠাকুমার মালা-জপের থলেই ভরসা !

ইতিহাস পড়তে পড়তে খোদন আপন মনে ভাবে কত রাজা, বাদ্‌শা, সেনাপতি দেশ জয় করেছে, কত কবি নানা ছন্দে গ্রন্থ রচনা করেছে, কত শিল্পী নানা রঙের অনবদ্য ছবি এঁকেছে, কত ভাস্কর বিচিত্র সব মূর্তি তৈরি করেছে, কত নাবিক অজানা দেশ আবিষ্কার করেছে, কত গায়ক গান গেয়ে মানুষের অন্তর জয় করেছে। তাদের সবাইকার জীবনী ওদের পাঠ্যপুস্তক থেকে মুখস্থ করতে হয় ! খোদনের নামটা কি এই তালিকায় কোনমতেই কায়দা করে ঢুকিয়ে দেয়া যায় না ?

ভেবে ভেবে খোদন মাথার চুল ছেঁড়ে, কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পায় না !

অনেক ভেবে চিন্তে খোদন ঠিক করলো, সহজ উপায় হচ্ছে তাড়াতাড়ি গান শিখে নেয়া।

ওর দিদি বেশ গান গাইতে পারে। সব বাড়িতেই তার আদর। আত্মীয়-স্বজনরা তাকে খাতির করে নিজেদের বাড়ি নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। কত গানের আসর থেকে তার ডাক আসে। বহু সংগীত-সম্মেলনে তাকে গাইতে হয়। পাড়ার রবীন্দ্র-জয়ন্তী আর সরস্বতী পূজোর আসরে তার কত খাতির ! এ ছাড়া রেডিওতেও সে মাঝে মাঝে গান করে। শোনা যাচ্ছে, দিদির গান নাকি রেকর্ড করা হবে। এই জন্যে দিদির ওপর খোদনের মাঝে মাঝে হিংসে হয় বৈকি !

খোদন তাই আপন মনে ঠিক করলে. দিদির চাইতেও নাম করবে। কাকামণির একটা গীটার আছে—গভীর রাত্রে আপন মনে বাজায়। অনেক রাত্তিরে সেই গীটারের বাজনা শুনতে শুনতে খোদন ঘুমিয়ে পড়ে।

খোদন তাই ঠিক করলে, গোপনে গীটার বাজনা শিখতে হবে।

একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে কাকামণির ঘরে উঁকি মেরে দেখলে, কেউ কোথাও নেই ! মা-কাকীমা-দিদি ওরা সব রান্নাঘরে খাবার করতে ব্যস্ত। ঝি-চাকরেরা যে যার কাজ নিয়ে আছে। এই গীটার শেখবার উপযুক্ত অবসর। কাকামণির ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। দেয়ালে গীটারটা ঝুলছিল। সেইটে নামিয়ে নিয়ে আপন মনে বাজাতে শুরু করে দিলো। হঠাৎ খটাং করে গীটারের কি যেন ছিঁড়ে গেল।

এখন উপায় ?

তাড়াতাড়ি গীটারটাকে আবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে। কিন্তু সেদিন একটু বেশী রাত্তিরে বাড়িতে হইচই পড়ে গেল। কাকামণির এত সাধের গীটারের এমন অবস্থা কে করলে ?

আসল অপরাধী যে কে, সেটা খুঁজে বের করতে বাড়ির লোকের বিলম্ব হলো না। কাকামণি

কে যে এসে খোদনের কান পাকড়ে ধরল। [পৃষ্ঠা ২৭৯

এমনিতেই একটু রগচটা মানুষ। তায় শখের বাদ্যযন্ত্রের এই অবস্থা! কাকামণি এগিয়ে এসে খোদনকে এই মারে ত' এই মারে! শেষকালে কাকীমা ছুটে এসে ওকে কোন রকমে বাঁচায়। বলে, রক্ষে কর খোদন, আর তোকে বাজনা শিখতে হবে না। আমি তোকে সুন্দর ছবি আঁকা শেখাবো।

ছবি আঁকা? খোদন উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

কাকীমার কাছ থেকে ভাল করে ছবি আঁকা শিখে নিতে হবে। সুতরাং একটা শুভদিন দেখে শুরু হলো খোদনের শিল্পচর্চা।

কাকীমা বেশ মন দিয়েই খোদনকে ছবি আঁকা শেখাতে লাগলো!

প্রথমে পেন্সিলে ড্রইং করা, তারপর রঙীন পেন্সিলে মজাদার ছবি আঁকা, এরপর প্যাস্টেলে মানুষের মুখ আঁকা।

শুরু হলো জলরঙ্ দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা!

খোদনও বেশ মজা পেয়ে গেল ছবি আঁকার ব্যাপারে।

নানা জাতের ছবি আঁকা শুরু করে দিলো খোদন। যাকে বলে, ছবিতে ছবিতে ধূল-পরিমাণ।

কত রকমের কাগজ যে এলো ছবি আঁকবার জন্যে, তার হিসেব করা শক্ত। পাতলা কাগজ, মোটা কাগজ, রঙীন কাগজ, তুলোট কাগজ— তুলির টানে রকমারী সব ছবি তৈরি হতে থাকল। ঠাকুমা বললে, আমায় একখানা লক্ষ্মীর পট এঁকে দিস খোদন, ঠাকুরঘরে টাঙিয়ে রাখবো। দাদু কইলে; খোদন, আমায় একটা বিদ্যা-সাগরের ছবি এঁকে দিস। মানুষ তো ওই একটাই। শিয়রে ঝুলিয়ে রেখে দেবো। মা বললে, ওরে খোদন, আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণ আর শ্রীশ্রীমার ছবি বড় করে এঁকে দিস। যাতে ঘুম থেকে উঠেই ওঁদের দেখতে পারি। দুজনকে প্রণাম করে সংসারের কাজে লাগতে পারি।

খোদন কাউকেই নিরাশ করে না। বড় বড় করে ছবি আঁকে। সব ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়।

সেদিন ছোট ভাইয়ের আবদার। দুই বেড়ালের ঝগড়া এঁকে দিতে হবে।

তাদের ইস্কুলে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হবে। দুই বেড়ালের ঝগড়ার ছবি সেইখানে ঝুলিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ছোট ভাইয়ের আবদার রাখতে গিয়ে কাগজ নিয়ে মুশকিলে পড়ল খোদন। সারা বাড়িতে একটা মোটা কাগজ মিলছে না। এ ঘর দেখে, সে ঘরে খোঁজে। একটা মনের মত মোটা কাগজ পায় না।

অবশেষে খোদন গিয়ে ঢুকলো তার বাবার বৈঠকখানায়।

বাবা নামকরা উকিল। তাঁর দেরাজে নানা রকম মোটা কাগজ রোল করা থাকে। তার থেকে একটা ভারি মোটা কাগজ নিয়ে খোদন পালিয়ে এলো নিজের ঘরে।

দুই বেড়ালের ঝগড়া ছবিটা প্রায় অর্ধেক আঁকা হয়েছে, এমন সময় নীচের বৈঠকখানায় দারুণ শোরগোল শোনা গেল।

মক্কেল এসে বসে আছে। একটা মোটা দামী কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না! তাতে কী নাকি উইল লেখা হবে। সেই জন্যে আগে থেকে দামী কাগজটা যোগাড় করে রাখা হয়েছে।

হঠাৎ কে যেন গিয়ে খবর দিলো, আমাদের খোদন একটা মোটা কাগজে "দুই বেড়ালের ঝগড়া" আঁকছে। পর মুহূর্তেই সিঁড়িতে চটির ফটফট শব্দ শোনা গেল। কে যে এসে খোদনের কান পাকড়ে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল, সেটা জানা গেল অনেক পরে।

খোদনের মন-মেজাজ একেবারে খিঁচড়ে গেল। পরে সে খবর পেলে, যার জন্যে সে ছবি আঁকছে, সেই মূর্তিমান ভাইটিই নীচে গিয়ে ঐক ফাঁকে খবরটি দিয়ে এসেছে।

যার জন্যে করি চুরি—সেই বলে চোর!

সুতরাং খোদন ছেড়ে দিলো পথটা, বদলে গেল মতটা!

এরপর খোদন অনেক গবেষণা করে ঠিক করলে, নিজেই পাড়াতে একটা সমিতি গড়ে তুলবে, আর তাতে ধুম করে সরস্বতী পূজো করবে।

পূজোর জন্যে পাড়ার ছেলেদের দলে টেনে নিলে। চাঁদার রশিদ-বই ছাপান হলো। অনেক টাকা চাঁদা তোলা হলো, কুমোরটুলিতে ফরমাস দিয়ে নতুন ধরনের মূর্তি তৈরি করা হলো। পাড়ার খোলা মাঠে প্যাণ্ডেল বাঁধা হলো, মঞ্চ সাজান হলো, পুরোহিত ঠিক করা হলো। নৈবেদ্য ও ভোগের আয়োজন করা হলো।

খোদন বললে, না খেয়ে থাকতে হবে অঞ্জলি দেবার জন্য। যারা আগেই কুল খেয়ে নিয়েছে, তাদের নাম কিন্তু অঞ্জলি দেবার তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেল।

ছেলেমেয়েরা সবাই ভোরে স্নান করে পূজোর ফুল যোগাড়ে মেতে উঠলো।

এদিকে বেলা বেড়ে যায়। পুরোহিত ঠাকুর আর আসে না।

ধীরে ধীরে অঞ্জলি দেবার লোকের সংখ্যা কমতে লাগলো। খিদের ঠেলায় সবাই বাড়ির দিকে পোঁ-পাঁ দৌড়!

খোদন হুমকি দিয়ে বললে, কেউ না থাকে, আমি উপোস করে থাকবো। সমিতির হয়ে আমি একাই অঞ্জলি দেবো।

বেলা চারটে যখন পুরোহিতের দেখা পাওয়া গেল, তখন খোদনকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

খোদন কোথায়, খোদন?

চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠলো। একদল ছেলে গিয়ে দেখে, খোদন প্রতিমার পেছন দিকে লুকিয়ে গপাগপ প্রসাদ চুরি করে খাচ্ছে!

সেই থেকে ছেলে-মহলে খোদনের খ্যাতি রটে গেল—"অনশনশ্রী খোদন!"

যে করে হোক, অবশেষে খোদন খ্যাতিলাভ করেছে!!

——

২৭৫ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর

জলে ভাসবে খুব আস্তে আস্তে ছাড়লে।

আপনি বেরিয়ে এসে দেখুন কোকিল ও নয় আসলে ও একটা মানুষ। আমি ওকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম।
তাড়িয়ে দিলে! হতচ্ছাড়া, তুমি আমার বৌকে তাড়িয়ে দিয়ে এলে?
আপনার বৌকে কোকিল সাজিয়ে ছিলেন তা আমি কেমন করে জানব? আপনি রাগ করছেন?
হাঁ- আমি রাগ করছি। করব না রাগ! তুমি আমার ধনে বিক্রী করেছ। আমার কুকুরটাকে তাড়িয়েছ। ভেড়াটাকে আঁকে ডুবিয়েছে।

শেষ কালে আমার বৌকে পর্যন্ত ঘরছাড়া করে ছাড়লে? এর পরেও আমি রাগ করব না! আমি ভীষণ রেগে গেছি!

তা-বেশ-- তা বেশ! আপনি যত খুসি রাগ করুন আমার আপত্তি নেই। কিন্তু শত মত আমায় দু ধামা টাকা দিয়ে দিন আমি বাড়ী যাই!

এই নাও! তোমাকে দু ধামা টাকা দিলাম! এবার আমাকে রেহাই দাও!

ফাঁদ সেই টাকা নিয়ে বাড়ী এসে, জমি জমা কিনে, মা- বাবা আর ঘুঘুর সঙ্গে বেশ সুখে বাস করতে লাগল।

শেষ

চোরের শাস্তি

হিমালয়নির্ঝর সিংহ

অনেকদিন আগেকার কথা। হুগলা জেলায় হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের ওপর বেলমুড়ি গ্রামে বাস করত এক নাপিত। তার নাম ব্যাচারাম পরামাণিক। ব্যাচারাম লোকটি খুব সাদাসিধে ধরনের, কিন্তু বুদ্ধিমান ; বয়েস প্রায় বছর পঁচিশের কাছাকাছি। ব্যাচারামের ভিনকুলে কেউ ছিল না। নিজের বলতে তার শুধু ছিল একটা গরু, একটা টিয়াপাখি আর কিছু মুরগী।

সকাল হলেই ব্যাচারাম তার কাঠের বাক্সটি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত। বাক্সের মধ্যে থাকত খুর, কাঁচি, ক্লিপ, চিরুনি আর মরুন। বাঁ হাতে ব্যাচারামের থাকত একটা আয়না আর বোতলে খানিকটা জল। ডান হাতে বাক্স আর বাঁ হাতে আয়না আর জলের বোতল নিয়ে ব্যাচারাম এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। সন্ধ্যে হলে বাড়ি ফিরে এসে ভাত রান্না করে খেত এবং তারপর পড়ে পড়ে অঘোরে ঘুমোত। সারাদিন তার গরুটা মাঠে মাঠে চরত। মুরগীগুলো এর ওর বাড়ি ঘুরে ঘুরে খাবার ঠুকরোত আর টিয়াপাখিটা হাতু, ছোলা ঠুকরোত আর দাঁড়ে বসে দোল খেত।

একদিন গভীর রাত্রিতে ব্যাচারাম যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে সেই সময় তার বাড়িতে চোর এল। চোরকে দেখে গরুটা ভয়ে 'হাম্বা' করে চেঁচিয়ে উঠল ; কিন্তু ব্যাচারামের তাতে ঘুম ভাঙল না। চোরটা আস্তে আস্তে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। তারপর কায়দা করে ব্যাচারাম যে ঘরে ঘুমোচ্ছিল সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ব্যাচারাম তো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। চোর এদিকে তার বাক্স-প্যাঁটরা খুলে টাকা-পয়সা, কাপড়, চোপড়—যা যা পারল সব নিয়ে চোঁ চোঁ করে ছুটে পালিয়ে গেল। চোরটা ছুটছে, পেছু পেছু আর একটা কে যেন ছুটছে। অন্ধকার রাত, তার ওপর বর্ষাকাল ; টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কাছের জিনিসই ঠাহর করা যাচ্ছে না।

চোরটা ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে, কিন্তু কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না। তার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। পেছনে কে

যেন আসছে! একটা ফৎ ফৎ শব্দ···ভূত-টুত নয় তো? চোরটার এবারে খুব বেশী আতঙ্ক হল। সে আরও জোরে ছুটতে লাগল। ফৎ ফৎ শব্দটাও আরও দ্রুততার সঙ্গে তার কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। সে 'রাম', 'রাম', 'দুর্গা', 'দুর্গা' বলে আরও জোরে ছুটতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাল সামলাতে পারল না, ভিজে রাস্তায় কাদাতে পা হড়কে ঝপাং করে পড়ে গেল মাটিতে। তারপর অতি কষ্টে চোরটা উঠে রাস্তায় দাঁড়াল বটে, কিন্তু তার হাতে বড্ড যন্ত্রণা হতে লাগল। এতো তীব্র যন্ত্রণা যে তার পক্ষে উঠে দাঁড়ানোই অসম্ভব হয়ে উঠল, চোরাই মাল নিয়ে পালানো তো দূরের কথা। তাই শেষ পর্যন্ত বোঁচকা-বুঁচকি পথের ওপর ফেলে রেখে চোরটা কাঁদতে কাঁদতে কোনরকমে তার বাড়ির দিকে পালিয়ে গেল। ব্যাচারামের পোষা গরুটা চোরকে তাড়া করে এতটা পথ এগিয়ে এসে একটু ক্লান্ত হয়েছিল, কিন্তু সে সামান্যই। গরুটা দাঁত দিয়ে কামড়ে চোরের ফেলে যাওয়া বোঁচকা-বুঁচকি-গুলো নিয়ে ব্যাচারামের বাড়ির দিকে রওনা হল।

এদিকে হয়েছে কি, চোরটা বাড়ির থেকে পালানোর সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়ের থেকে টিয়াপাখিটা চেঁচিয়ে ব্যাচারামকে ডেকে বলল—

ও ব্যাচারাম দাদা,
রাস্তাতে জল কাদা
চোর যে চুরি করে পালায়
তাকে এখন ধরা যে দায়
তুমি কেমন হাঁদা?
ওঠো ব্যাচারাম দাদা।

টিয়াপাখির চিৎকারে ব্যাচারামের ঘুম ভেঙে গেল। সে, তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে বসে কি ঘটেছে আগাগোড়া সব জানতে চাইল। একটা লাল ঝুটিওলা মুরগী ছুটে এসে বলল—

চোরটা বড় পাজী
ধরব তাকে আজই

বলেই মুরগীটা লাফাতে লাফাতে বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেল। আর একটা মুরগী ব্যাচারামকে বলল—

গরু গেছে বাইরে
কোন ভয় নাইরে
আসবে যে চোর ধয়ে
রাত্রে, না হয় ভোরে।

কিন্তু ব্যাচারামের তো ওসব কথায় খুশী মনে বাড়িতে থাকার উপায় নেই। ওসব জন্তু-জানোয়ারের কথায় বিশ্বাস করে সে খুশী মনে ঘরে বসে থাকেই বা কেমন করে! চোরে তার সর্বনাশ করে চলে গেল, আর ব্যাচারাম কি না বাড়িতে বসে থাকবে? সে হন্তদন্ত হয়ে একটা ভাঙা ছাতি হাতে নিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

পথের মধ্যে খানিকটা যাবার পর ব্যাচারাম তার গরুটাকে দেখতে পেল। গরুটা মুখে করে বোঁচকা-বুঁচকিগুলো টেনে নিয়ে আসছিল। এবার ব্যাচারাম তো মহাখুশী। সে আনন্দে লাফিয়ে বলে উঠল—

ওরে আমার গাই
তোর যে জোড়া নাই
চোরের থেকে তুই বাঁচালি
তুই যে আমার ভাই।

গরুটা খুশী মনে বলল—'হাম্বা।'

ব্যাচারাম জিনিসপত্রগুলো বাড়িতে তুলে রাখল। বোঁচকা-বুঁচকিগুলো পেতে গুছিয়ে রাখল। তারপর দরজায় তালা বন্ধ করে গরুটাকে একটু আদর করে ভাঙা ছাতি হাতে নিয়ে চোরের খোঁজে পথে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে হয়েছে কী, সেই মুরগীটা লাফাতে লাফাতে ছুটতে ছুটতে চোরের কাছে গিয়ে হাজির। চোরের হাত ভাঙা; পড়ে গিয়ে পায়েও ভীষণ

ব্যাচারাম ছাতার বাঁকানো হাতলটা দিয়ে চোরের গলাটা পেঁচিয়ে ধরল।

যন্ত্রণা হচ্ছে। তাই সে কোনরকমে আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাস্তায় হাঁটছিল। মুরগীটা চোরকে দেখেই বলে উঠল—

ওরে ব্যাটা চোর
সব দোষ তোর
তুই খুব পাজী
ঠোকরাবো আজই।

এই বলেই মুরগীটা তার ধারালো ঠোঁট দিয়ে চোরটাকে প্রচণ্ডভাবে ঠোকরাতে লাগল। চোরটা মুরগীর ঠোকর খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মুরগীর ধারালো ঠোঁট লেগে চোরটার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। সে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল—

শিক্ষা হল খুব
পুকুরে দেই ডুব।

এই বলে চোরটা পাশের একটা পুকুরে ঝপাং করে ঝাঁপ দিতে যাবে এমন সময় ব্যাচারাম সেখানে এসে পড়ে তার ছাতার বাঁকানো হাতলটা দিয়ে তার গলাটা পেঁচিয়ে ধরে বলল—

ওরে ব্যাটা চোর
বুদ্ধি কি নেই তোর ?
আমার বাড়ি চুরি ?
মারব বুকে ছুরি।

চোরটা ততক্ষণে ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে। নাথিতের পা জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল—

ছেড়ে দিলুম চুরি।
মেরে না আর ছুরি।

ততক্ষণে সেখানে বেশ ভিড় জমে গেছে। পাড়ার ছেলেরা এসে চোরের নাজেহাল হওয়া অবস্থা দেখে খুব মজা পাচ্ছে। ব্যাচারামের গরু এবং মুরগীগুলোও ততক্ষণে সেখানে এসে গিয়েছে। মুরগীরা বলল—

কঁকোর কঁকোর কঁ
মাথায় টুপি পরে ব্যাটা
পাড়া ঘুরবি চ।

গরু বলল—

হাম্বা হাম্বা গঁ
কাদা মেখে তুই ব্যাটা চোর
জেল খানাতে চ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

(১)

পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে সমুখের উপত্যকাটা নিরীক্ষণ করছে ওরা। ঐ রাহুল আর মোবারক। অস্ত-সূর্যের লালচে আলো তখনও সে-উপত্যকার পাথুরে ঘরগুলোর গড়ানে ছাদে ছাদে ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। নীচে কিন্তু ছায়া ঘনিয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই, এখানে ওখানে ডেকে উঠছে ঝোপে-ঝাড়ে পাহাড়িয়া শেয়াল।

"আজ রাতে আর নামতে চাই না রাজা!"—চিন্তিতভাবে বলল মোবারক।

রাহুলের নিষেধ সত্ত্বেও মোবারক রাজা বলে সম্বোধন করছে তাকে আজকাল। 'মহারাজই' বলবার বাসনা তার ছিল, ওদের জবানে 'শাহান-শাহ'। রাহুল কড়া আপত্তি জানানোয় ফলে মহারাজ সংক্ষিপ্ত হয়ে রাজাতে দাঁড়িয়েছে। শাহানশাহ নেমে এসেছে জাঁহাপনায়।

"আমি তাহলে তোমাকে উজির বলব"—এমন সুরে বলেছিল রাহুল, যেন উজির বলে আহুত হওয়া একটা মস্তবড় শাস্তির ব্যাপার।

"স্রেফ তারিখ বলুন রাজা। তাইতেই যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হবে অধমকে। আপনি জানেন না, তারিখ কথাটি হল তরক্ষু শব্দের অপভ্রংশ। তরক্ষু ছিলেন শঙ্করাদিত্য মহারাজের মন্ত্রী। এমন মহৎ লোক ছিলেন তিনি যে, তাঁর বংশধারায় শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিজের নামের শেষে ঐ তরক্ষুটি যোগ করে গিয়েছেন সেরা সম্মানের পদবি হিসাবে।"

"তুমি মন্ত্রী তরক্ষুর বংশধর?"—অবাক্ হয়ে গিয়েছিল রাহুল।

মোবারক মাথা নীচু করেছিল। মুখে তখন তার লজ্জা আর বিষাদের ছাপ। নিজের কাহিনী সে সেই সময়ই কতকটা বলেছিল রাহুলকে। শঙ্করাদিত্যের বংশধরেরা যেমন পুরুষানুক্রমে হয়ে

উত্তেজনায় রাহুল সিংহের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করেছিল।

আসছিলেন নওবাং (নয়া বাংলা) রাজ্যের রাজা, পুরুষানুক্রমে মন্ত্রী পদও তেমনি লাভ করে যাচ্ছিলেন তরক্ষু বংশীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা, দু'শ বছর আগে পর্যন্ত। তারপরে তরক্ষু বংশের উপরে নেমে এল এক অভিশাপ। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বলতে নওবাংয়ের কিছু ছিল না। নিকটতম আদিবাসী গোষ্ঠীর বাসস্থান ছিল অন্ততঃ তিনশো মাইল দূরে। ঐ সময়ে এই আদিবাসীরা দীক্ষিত হল মুসলিম ধর্মে এবং যেহেতু নওবাংবাসীরা মুসলিম নয়, স্রেফ সেই কারণেই অভিধান করল নওবাংয়ের দিকে। তখন সেখানে রাজা ছিলেন এক বালক। রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত ছিল মন্ত্রী ভূপাল তরক্ষুর হাতে। শত্রুপক্ষের ফুসলানিতে তিনি হলেন বিচলিত। এমন ভাবে জমিন তৈরি করতে লাগলেন, যাতে শত্রুর আক্রমণ ঘটলে পরে নওবাং সেনা বিনা যুদ্ধে পরাজয় মেনে নেয়। কিন্তু মহাভুল করেছিলেন তিনি। গুরু বিশ্বরূপ ভারতীর শক্তির পরিচয় তাঁর জানা ছিল না।

"গুরু বিশ্বরূপ ভারতী?"—রাহুল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"এক গুরুর কথা তুলোটের লিখনে আছে, তিনি ছিলেন মহারাজ শশাঙ্কর গুরু কৃষ্ণভারতী—"

"তাঁরই শিষ্য পরম্পরায় হাজার বছর পরের মানুষ উনি।"

এসব কথা হয়েছিল কয়েক দিন আগে।

"তাঁরই শিষ্য পরম্পরায়" খবরটুকু দেওয়ার পরে সে আর বেশী দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি তার গল্পকে। একটা সিংহ হুঙ্কার করে উঠেছিল পিছন দিকে একশো গজের মধ্যে। ভাগ্য ভাল যে, হাওয়া উলটো বইছিল তখন! থাবার নাগালে এই দ্বিপদযুগলের অবস্থিতির কথা জানতে না পেরে উদরাগ্নির দহনে ক্ষিপ্তপ্রায় পশুরাজ গোটা অরণ্যটাকেই বুঝি শাসাচ্ছিল রোষে এবং আক্রোশে। রাহুল আর মোবারক একা হলে তারা ওকে এড়িয়ে নিঃশব্দে দূরে চলে যেত। কিন্তু একা ত তারা নয়। সঙ্গে দোসর রয়েছে দুই খচ্চর। সিংহের ডাক শুনেই খচ্চরেরা বিকট আওয়াজে কেঁদে উঠল। সিংহ বিদ্যুতের বেগে ফিরে দাঁড়াল এদের দিকে—

তখন বাধ্য হয়েই রাইফেল তুলে নেওয়া। সিংহ তখন ধেয়ে আসছে। মোবারকের এসব দেখা আছে। কিন্তু ধাবমান সিংহ দর্শন তার রাজার পক্ষে এই প্রথম। উত্তেজনায় রাহুলের হাত কেঁপে গেল, মাথা লক্ষ্য করে যে গুলি করেছিল,

তা বেরিয়ে গেল কানের পাশ দিয়ে। কিন্তু মোবারকের গুলি লাগল ঠিক কপালে সিংহটার। সে হাঁটু মেড়ে বসে পড়ল ঠিক দৌড়ের মুখেই। মাথার আদ্ধেকটা গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে তার, তবু সেই অবস্থাতেই পিঠ টানটান করে, প্রায় মাটিতেই দেহটাকে লেপটে দিয়ে লেজ আছড়ে যাচ্ছে, আবার লাফ দেবার বাসনায়। ঠিক তখনই ছুটল রাহুলের দ্বিতীয় গুলি। মোবারকের গুলির গা ঘেঁষে তা সেঁধিয়ে গেল পশুরাজের মাথায়। আর তাকে দিতে হল না লাফ, টানটান দেহ শিথিল হয়ে আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ল মাটিতে।

এ হল কয়েকদিন আগের কথা। সেই যে ছেদ পড়েছিল মোবারকের আত্মকাহিনীতে, আর নতুন করে গল্পের আসর বসাতে উৎসাহ হয়নি তার। কথাটা তার পূর্বপুরুষদের লজ্জার ও পাপের, সেটা খুলে বলার তাগিদ আসতে পারে একমাত্র প্রবল ভাবাবেগের মুহূর্তে। তা এ কয়দিন এমন অবিশ্রান্তভাবে ওরা ছুটিতে ছুটেছে সারা দিন, আর এমন গভীর ঘুমে কাটিয়ে দিয়েছে সারা রাত যে, আবেগ মোবারকের মনে তিলার্ধের জন্যেও পয়দা হতে পারেনি।

আজই প্রথম দিবালোক থাকতেই পা চালানো বন্ধ করেছে ওরা। মোবারক নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে নীচের ছায়াধূসর গাঁ-খানির দিকে। চোখ না ফিরিয়েই ধরা গলায় বলল—"আজ রাতে আর নামতে চাই না রাজা—"

রাহুল বলল—"সে তোমার ইচ্ছে তারিখ! রাত কাটাবার পক্ষে এই পাহাড়ের মাথাও চমৎকার হবে। তবে আগুন জ্বাললে উপত্যকার লোকে তা দেখতে পাবে নিশ্চয়! আর আগুন না জ্বেলে উপায়ই বা কী? এত উঁচুতে জানোয়ারেরা উঠবে না হয়ত, কিন্তু সাপ? যা গিজগিজ করছে ওরা চারদিকে—"

"না, আগুন না জ্বাললে চলবে না রাজা! তবে এমন জায়গা আছে নিকটেই, যেখানে আগুন জ্বাললেও নীচের লোকে পাবে না দেখতে—"

এই বলে দুই হাতে দুটো খচ্চরের লাগাম ধরে মোবারক সোজা এগিয়ে গেল আরও কিছু দূর, প্রায় কাঁধি ঘেঁষে ঘেঁষেই ঐ খাড়া পাহাড়ের। হঠাৎ তাদের পথটা ঢালু হতে হতে নেমে গেল দশ বারো ফুট, ডাইনে অর্থাৎ উপত্যকার দিকে একটা উঁচু টিলার সৃষ্টি করে। খচ্চর নিয়ে যখন দাঁড়িয়ে পড়ল মোবারক, তখন তার ডাইনে দেখা গেল, সেই উঁচু টিলার গায়ে একটা আধ-মানুষ সমান ফোকর—

"এ ফোকরটা বলতে গেলে একটা দরোজা। বাইরে থেকে যেটাকে টিলা বলে মনে হচ্ছে রাজা, আসলে সেটা গুহা একটা। রাত আমরা সেখানেই কাটাতে পারব, আগুন জ্বেলেও। যদি অবশ্য আমি এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে এ গুহায় স্থায়ী বাসিন্দা কেউ আমদানি না হয়ে থাকে, দোপেয়ে বা চারপেয়ে!"

"কথায় ভাবে মনে হচ্ছে, এ অঞ্চলে তুমি আগেও ছিলে?"—মন্তব্য করল রাহুল।

সেদিনকার সেই মলিন হাসি আজ আবার মোবারকের অধরে দেখা দিল, রাহুলের একথা শুনে। একটা নিশ্বাস ফেলে সে বলল—"ছিলাম বই কি রাজা, আমার জন্মস্থান ঐ গ্রামই। শুধু আমি কেন, আমার জন্মের আগে তরফ্ বংশের সাত পুরুষ ধারাবাহিক বাস করে গিয়েছেন ওখানে।"

"তোমার সেদিনকার কাহিনী ত তুমি শেষ করনি, তারিখ!" —কথার সুরে কৌতূহল যেন বড় বেশী প্রকাশ না পায়, সেদিকে রাহুল খুব নজর রাখছে।

"আজই শেষ করব"—বলে খচ্চরের লাগাম

দুটো বৃহৎ ফণাধর রক্তে মাখামাখি হয়ে ছটফট করছে।

ছেড়ে দিল মোবারক। তারা রুক্ষ পাথরে গজানো শুকনো ঝোপ-ঝাড়ের হলদে পাতা চিবুতে থাকল দুই একটা করে। মোবারক তখন এক হাতে নিয়েছে টর্চ, অন্য হাতে বন্দুক—"আপনি তৈরি থাকুন রাজা"—এই বলে সে ঢুকে পড়ল সেই ফোঁকরে। আর তার পরই এক মিনিটের মধ্যে তার রাইফেল গর্জে উঠল পরপর তিনবার। রাহুল ছুটে এগিয়ে গেল, রাইফেল উঁচিয়েই ঢুকল গুহায়—

"দোপেয়েও নয়, চারপেয়েও নয়, সেই জীব, যার মোটেই পা নেই" বলল মোবারক। রাহুল দেখল টর্চের আলোতে—দুটো বৃহৎ ফণাধর রক্তে মাখামাখি হয়ে ছটফট করছে গুহার এক কোণে, আর এক কাঁড়ি সাপের ডিম গুলির আঘাতে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে পড়ে আছে একটা কদর্য পরিবেশ সৃষ্টি করে।

মোবারক তখন চারিদিকে ঘোরাচ্ছে টর্চের আলো। আর কোথাও দেখা যায় কিনা সাপের ডিম বা ধাড়ি সাপ, দেখছে সেটাই।

নাঃ, চোখে পড়ে না আর কিছু।

রাতে শোবার পক্ষে গুহাটা জায়গা ছিল ভাল। কিন্তু সাপ? চেহারা দেখেই মনে হয় এ সব সাপ সাক্ষাৎ যমদূত এক একটি! আর পাথরের দেয়ালে খাঁজ খন্দ চিড়ও রয়েছে ঢের। কোথায় কে আত্মগোপন করে আছে, ঠিক কী। কিন্তু রাহুল বলল—"অত ভয় করলে চলে না। মেঝেতে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে আমরা শুয়ে পড়ি এস। আগুন ত জ্বলবেই, তা ছাড়া কার্বলিক অ্যাসিড আছে সঙ্গে, তাই দিয়ে একটা চওড়া করে গণ্ডী এঁকে দাও আমাদের শোবার জায়গাটা ঘিরে।"

বিনীত হাসি হেসে মোবারক বলল—"একেই বলে সৈনাপত্য। অ্যাসিড সঙ্গে এসেছে আমাদের, তা আমি জানতামই না।"

রাহুলের সাহায্যে রাত্রিযাপনের সব বন্দোবস্ত পাকা করে নিয়ে আগুন জ্বেলে ফেলল মোবারক। শুকনো ডালপালায় কিছু অভাব নেই ঝোপে-ঝাড়ে। কয়েক পাঁজা কয়েক মিনিটেই যোগাড় হয়ে গেল।

খচ্চরের পিঠ যেন যা-লেবে-তাই ভাণ্ডার একটা। সেখান থেকে চায়ের সরঞ্জাম এল। "মেহনতের জীবন যাপন করতে হলে উৎকৃষ্ট পানীয় হল চা। কফি? ওটা বিলাসের বস্তু। মওবাংয়ের দরবারে যদি বসি কোন দিন রাজা-

উজির হয়ে, তখন ফর্মাইস করব কফির, এখন চলুক আমার বাংলাদেশের দার্জিলিং টী।"

মোবারক ছিল হোটেলের ম্যানেজার, কিন্তু চা কেমন করে বানাতে হয়, তা জানে না। রাহুলই শেখাচ্ছে তাকে।

"কী করে কী করি, দেখতে থাক। কিন্তু রসনা তোমার যেন চুপ করে না থাকে। অসম্পূর্ণ গল্পটা আজ শেষ করবে বলে অঙ্গীকার করেছ। দ্বিতীয় পল্টন সাপ বেরুবার আগেই তা শেষ করে ফেল। মরি যদি, অন্ততঃ এ আফসোস নিয়ে যেন মরতে না হয় যে তারিখ মোবারকের ইতিহাস অজানা রয়ে গেল।"

"রাজাজ্ঞা শিরোধার্য।"—আবার নিশ্বাস পড়ল মোবারকের—"তা ছাড়া রাজাজ্ঞা না হলেও ইতিহাসটা জানানো আমার কর্তব্যই ছিল। যাকে অনুচর হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তার ভাল-মন্দ সবকিছু জানবার অধিকার আপনার আছে—"

রাহুল রেগে উঠল—"তোমার সবই ভাল, মন্দ কেবল এই একটা জিনিস, তোমার অতিভক্তি। আমার দেশে অতিভক্তি সম্পর্কে একটা কী যেন অপবাদ আছে, ওটা কী একটা খারাপ জিনিসের নাকি লক্ষণ। আমি সে অপবাদে কান দিই নে। কিন্তু তুমি আমি সমবয়সী প্রায়। চলেছি এক সাথে, অজানা এক পরিণামের উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে দুজনের ভিতরে যে সম্পর্কটা থাকলে ভাল হয়, সেটা হল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। অসমকক্ষতার নয়। নাও, এখন বল—"

ধোঁয়ানো চা দিয়ে যে-দুটো বাটি ভরতি করে দিল রাহুল, তাদের বাটি না বলে বলা উচিত গামলা। মোবারক টিন থেকে বার করল বিস্কুট এক গাদা। এই দিয়ে এখন সারা দিনের ক্ষুধা ত মিটুক, তারপর—

আগুন জ্বলছে, দুটো ভাত ফুটিয়ে নিতে কতক্ষণ? পথে আসতে এক নালায় তোয়ালে চাপা দিয়ে দুটো মাছ ধরেছিল রাহুল, সে দুটোও সংরক্ষিত আছে খচ্চরের পিঠে। "উপাদেয় ঝোল হবে, দেখে নিও"—রাহুল অন্ততঃ দশ বারও শুনিয়েছে মোবারককে, অথবা বলা যায়, মোবারককে লক্ষ্য করে নিজের মৎস্যলোভী বাঙালী চিত্তকে। রাঁধতে পারলে সত্যিই উপাদেয় হবার কথা, কারণ, ধরা পড়েছে যদিও ওরা আফ্রিকার জঙ্গলে, জাত্যংশে ওরা মাগুর, দুটো মিলে অন্ততঃ হাফ কিলো। পাকা মাগুর যাকে বলে।

চা খেতে খেতে মোবারক ওদিকে শুরু করেছে ইতিমধ্যে—"অবধান করুন মহারাজ—"

রাহুল একখানা আস্ত বিস্কুট ছুঁড়ে মারল মোবারকের দাড়ি লক্ষ্য করে—"আবার? বলি নি যে, অতিভক্তি ইয়ের লক্ষণ?"

দাড়িতে সেঁটে বসতে না পেরে সুগোল বিস্কুটখানা তখন কোলের উপর পড়েছে মোবারকের। সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে প্রথমে মোবারক ছোঁয়ালো নিজের মাথায়, তারপর পরিতোষ সহকারে তাতে এক কামড় বসিয়ে বলতে শুরু করল—"অবধান করুন রাজা, তরফু ভূপালের বেইমানির কথায় পৌঁছেই সেদিন আমার গল্প বন্ধ করতে হয়েছিল—"

"ভূপালের বেইমানি এবং বিশ্বরূপ ভারতীর শক্তির পরিচয়। তুমি বলছিলে কৃষ্ণ ভারতীর শিষ্যপরম্পরায় হাজার বছর পরের এক গুরু ছিলেন ঐ বিশ্বরূপ—"

"হ্যাঁ রাজা! রাজবংশের গুরুরা ছিলেন সবাই আকুমার ব্রহ্মচারী, সিদ্ধযোগী। এক গুরু দেহরক্ষার সময় নিজের শিষ্যদের ভিতর থেকে যোগ্যতমকে বেছে নিয়ে তাঁকেই অভিষেক করে যেতেন রাজগুরু পদে। এইভাবে শিষ্যের শিষ্য, তাঁরও শিষ্য, তাঁরও শিষ্য এইভাবে—"

"বুঝেছি। ভূপাল-তরফুর সময়ে নওবাংয়ের বালক রাজা যদি থেকে থাকেন শঙ্করাদিত্য থেকে বত্রিশ নম্বর অধস্তন পুরুষ, ঐ বিশ্বরূপ ভারতীও অবশ্যই ছিলেন তাহলে কৃষ্ণভারতী থেকে বত্রিশ পুরুষ—"

"না রাজা, না"—প্রসাদী বিস্কুটখানা নিঃশেষে উদরসাৎ করে আবেগের সঙ্গে বলে উঠল মোবারক —"অত নয়। জোর কুড়ি কি একুশ কি বাইশ পুরুষ। রাজা-মন্ত্রীদের ইতিহাস আমার কণ্ঠস্থ আছে, গুরুদেরটা ততখানি নেই। কিন্তু তাহলেও নিশ্চয় করে বলতে পারি, বিশ্বরূপ কুড়ি বাইশ ধাপের বেশী নীচের লোক ছিলেন না কৃষ্ণভারতী থেকে। কারণ কি জানেন?"

বাধা দিয়ে রাহুল বলল—"একটাই কারণ হতে পারে। গুরুরা অবশ্যই ডবল দীর্ঘজীবী ছিলেন সাধারণ লোকেদের চেয়ে। কাশীর ত্রৈলঙ্গস্বামীর মত।"

"আপনার কাশীর কথা বা কী বললেন রাজা? —কী স্বামী? যে-স্বামীই হোন, তাঁর কথা আমি জানি নে কিছুই। কিন্তু ওকথা আপনি ঠিকই বলেছেন রাজা, গুরুরা অন্য মানুষদের চেয়ে দ্বিগুণ আড়াই গুণ বাঁচতেন সবাই। এখনও বাঁচেন শুনেছি। বলতে গেলে নওবাংয়ের ভারতী গুরুর কথা পৃথিবীতে প্রচার থাকলে বোধহয় দীর্ঘজীবনের দিক দিয়ে তাঁরাই পেতেন ফার্স্ট প্রাইজ—।"

এই পর্যন্ত বলেই মনস্তাপে জিভ কামড়ে ফেলল তারিখ—"গুরুকে নিয়ে ঠাট্টা করে বসেছি। হবে না কেন? আমি ত ধর্মচ্যুত! মতিভ্রংশ ত হবেই আমার।"

রাহুলের বিদ্যে যদিও স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত, তাহলেও শতাব্দীকের পাল্লায় পড়ে লাইব্রেরীতে বসে পড়াশোনা তাকে অনেক করতে হয়েছে। তাই এই মুহূর্তে ক্ষুব্ধ মোবারককে সান্ত্বনা দেবার মত যুক্তি বা ভাষার অভাব তার হল না। বলল —"কী বলছ ভাই তারিখ! ধর্মচ্যুত কেন হতে যাবে তুমি? হয়েছ মাত্র ধর্মান্তরিত। তাও তুমি নিজে হওনি, হয়েছিলেন তোমার বৃদ্ধ-প্রপিতা-মহেরা কেউ। হিন্দুধর্মে আর ইসলামে তফাৎ ত শুধু এই যে এক ধর্মের লোকে ভগবানকে ডাকে মন্দিরে গিয়ে, অন্য ধর্মের লোকে সেই একই উদ্দেশ্যে যায় মসজিদে। 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম'—বলেছেন আমাদের মহাত্মা গান্ধী—"

"হাঁ, হাঁ, তাঁর নাম আবিসীনিয়ায় বসেও শুনেছি আমরা! আর শুনেছি নেতাজী বোসের কথা, হিন্দু মুসলমানকে একত্র করে যিনি গড়ে ছিলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। তাঁদের আমরা এদেশে বসেও হরঘড়ি সেলাম বাজিয়েছি সে-সব দিনে—"

"তাই বলছিলাম, হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়ার দরুন কোন পাপ তোমার বা তোমার পিতৃপুরুষদের হয়নি। পাপ হয়েছিল ভূপাল তরফুর। দেশদ্রোহিতার মত পাপ আর কী আছে? কিন্তু এইবার শেষ কর গল্পটা—"

"হাঁ, বিশ্বরূপ ভারতীর শক্তি ছিল অসীম! কী বলে ওকে? আধ্যাত্মিক শক্তি? অভিধানে শব্দটা দেখেছি, ঐ আধ্যাত্মিক। মানে বুঝিনি। সে যা হোক, সেই শক্তির বলে তিনি ভূপাল তরফুর সব বেইমানির কথা টের পেলেন—সেনাপতিকে ডেকে সতর্ক করে দিলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন, সময় থাকতে ভূপালকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হোক—

"সে আদেশ তক্ষুণি পালিত হল। ভারতীর নির্দেশের বিরুদ্ধে একটি প্রাণীও কথা কইল না কোনার সুর্বাণে, ঐটিই হল নাওবাংয়ের রাজধানী। ভূপাল তরফু কিছুসংখ্যক অনুচর নিয়ে এসে বাস করলেন নীচের ঐ উপত্যকায়। ওখানে তখন

ছিল জনহীন অরণ্যভূমি শুধু। সপরিবারেই তাঁদের আসতে দিয়েছিলেন রাজগুরু।— সপরিবারে এবং কিছু কিছু অর্থসম্পদ্ নিয়ে। কালক্রমে বংশবৃদ্ধি হয়েছে তাঁদের। এখন লোকসংখ্যা এখানে হাজার-খানিক হবে অন্ততঃ, চারখানা গ্রাম নিয়ে তাদের বসতি।"

"কিন্তু ঐ ধর্মান্তরগ্রহণ? তার কারণ কি?" রাহুল জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

গভীর মনস্তাপের সঙ্গে মোবারক বলে উঠল— "কতকটা চাপ এসেছিল ভূপালের বন্ধু সেই মুসলিম রাষ্ট্র থেকে। তা ছাড়া, ভূপাল ত তখন মতিচ্ছন্ন! তিনি ভাবলেন, দেশ থেকে এই যে নির্বাসন, এর উপযুক্ত জবাব ঐ একটাই তিনি দিতে পারেন— দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মত্যাগও। কিন্তু এটা আপনি বিশ্বাস করুন রাজা, আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ সেই ভূপাল তরফের ভুলকে ভুল বলে আমরা তাঁর উত্তর পুরুষেরা তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই উপলব্ধি করছি। সে মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, কিন্তু নওবাং টিকে আছে এখনো। বিচ্ছিন্ন হয়েও আমাদের এই নাগোড়া উপত্যকা—

"নাগোড়া? নব গৌড়?" নিজের মনেই আওড়াল রাহুল।

"বিচ্ছিন্ন হয়েও নাগোড়ার মানুষ আজও নাওবাংয়েরই অনুগামী। শঙ্করাদিত্য মহারাজের বংশকেই আজও তারা রাজা বলে মানে, যদিও রাজনীতির বন্ধন এই দুই শতাব্দী ধরে একটুও নেই নাওবাং আর নাগোড়াতে।"

কথা শেষ হয়নি তখনও মোবারকের, যেন তার কথারই প্রতিধ্বনি করে, দূর থেকে একটা কোলাহল ভেসে এল হঠাৎ। বহু কণ্ঠে যেন জিগীর উঠছে— "নাওবাং নাগোড়া কু-উ-ম্! জয় হো নাওবাং নাগোড়া! আদিত্য মহারাজ কু-উ-ম্!"

সারা আফ্রিকায় চালু আদিবাসীদের ঐ কু-উ-ম্ হুঙ্কার। রাজভক্তিসূচক জয়ধ্বনি। (ক্রমশঃ)

তিনের জয়

ঘটনাটা অনেকেরই হয়তো জানা আছে। কিন্তু ঘটনার বৈশিষ্ট্য হয়তো কারো চোখে পড়েনি। পড়ল যখন রিপ্লে সাহেব সেটা তাঁর বই 'বিলিভ ইট অর নট' বইতে লিখে ছাপালেন। ঘটনাটা হল বিসমার্কের জীবনী নিয়ে। তিনি বলেছেন প্রিন্স বিসমার্ক তিনটি স্কুলে শিক্ষা লাভ করেছেন, তিনটি দেশের রাষ্ট্রদূতের কাজ করেছেন, তিন জন রাজার কর্মচারি ছিলেন, তিনটি যুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, ঘোড়ার উপর চড়ে থাকা অবস্থায় তিনটি ঘোড়া মারা পড়েছে, তিনটি শান্তি-চুক্তি সই করেছেন, তিন বার রাষ্ট্রচুক্তি করেছেন, তিনটি নামের অধিকারী ছিলেন (বিসমার্ক, স্কোয়েনহোসেন, লোয়েনবার্গ), তিনটি খেতাব পেয়েছিলেন (কাউণ্ট, ডিউক, প্রিন্স), তিন বার তাঁর জীবন হানির চেষ্টা হয়, তিন বার পদত্যাগ করেছিলেন আর তিনটি সন্তানের পিতা হয়েছিলেন। তাঁর সামরিক পোশাক (coat of arms) ত্রিপত্রের চিহ্ন ছিল। বোঝা যাচ্ছে বিসমার্ক ৩এর দৃষ্টিতে জন্মেছিলেন।*

* রিপ্লে থেকে

হূন দমন প্রভাকরবর্দ্ধন

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

মহারাজাধিরাজের দু'চক্ষু রক্তবর্ণ।

সিংহাসনের সমুখে দাঁড়িয়ে বল্লভীপুরের রাজদূত ঈশানবর্ষ। মস্তক তাঁর এখনও উন্নতই রয়েছে বটে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি ভূমিবিন্যস্ত। দূতের পক্ষে দেশান্তরের রাজসভায় গিয়ে রাজার সঙ্গেও তর্কবিতর্ক করা চলে বটে, কিন্তু পরিস্থিতি সেই রকমই দাঁড়ায় যদি, বৈদেশিক দূতকে অতিমাত্র সাবধান হতে হবে, যাতে কথায় অসংযম না ফুটে বেরোয়, ভঙ্গিতে প্রকাশ না পায় বিন্দুমাত্র অশালীনতা। তাই তিনি অতিমাত্র বিনয়ী সেজেছেন, অপ্রিয় ভাষণের তিক্ততা সৌজন্য দিয়ে যতটা সম্ভব ঢেকে দেবার উদ্দেশ্যে।

পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে বই কি! গুর্জরের বিশাল এক ভূখণ্ডে বল্লভীপুরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় এক শতাব্দী আগে। সত্য বটে, উত্তর ভারতে তখন এমন কোন শক্তিমান কেন্দ্রীয় প্রশাসন বর্তমান ছিল না, সুদূর পশ্চিমের বল্লভীপুরে হূনের অনুপ্রবেশ রোধ করা যার পক্ষে সম্ভব ছিল। গুপ্তসাম্রাজ্যের সূর্য তখন অস্তাচলে। মগধে মালবে কনৌজে থানেশ্বরে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মত্ত হয়ে নগণ্য রাজন্যগণ সমগ্রভাবে ভারতের ইষ্ট চিন্তা করবার অবসর পাচ্ছেন না।

সেই অবসরেই হূনেরা এসে বল্লভীতে প্রতিষ্ঠিত করল নিজেদের। প্রথম রাজা তাদের মহাসেন, দ্বিতীয় বিশ্বক্সেন, তৃতীয় নৃপতি রুদ্রসেন এই সবে সিংহাসনে বসেছেন গত বৎসর।

আর এই সময়েই প্রভাকরবর্ধন প্রশ্ন করে পাঠিয়েছেন—বল্লভীপুরের অধিকার ত্যাগ করে মধ্য এশিয়ায় ফিরে যেতে রাজী আছেন কিনা রুদ্রসেন।

প্রশ্নটা থেকেই প্রভাকরবর্ধনের চরিত্রের আভাস খানিকটা মেলে। অতিমাত্র আত্মবিশ্বাস তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। উত্তর ভারতে একাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা, প্রথম যৌবন থেকেই এটা তাঁর স্বপ্ন এবং

সাধনা। সুযোগ তাঁর ছিল অনেক। মাতৃকুলের দিক দিয়ে তিনি মগধের গুপ্ত সম্রাট বংশের অন্যতম উত্তরাধিকারী। মাধব গুপ্ত, ঐ বংশের একমাত্র জীবিত বংশধর, প্রভাকরের অকৃত্রিম সুহৃৎ। মালবেশ্বর দেবগুপ্তও তাঁর অনুগত। সর্বোপরি কনৌজের গ্রহবর্মণ, তিনি ত থানেশ্বর-পতির কন্যাকে বিবাহ করে তাঁর পরমাত্মীয়ে পরিণত হতে যাচ্ছেন।

সুতরাং, প্রভাকরবধনের খুবই ভরসা আছে যে হূনদের বিতাড়িত করার জন্য একটা ধর্মযুদ্ধ জুড়ে দিলে সমগ্র উত্তর ভারত তাঁর পতাকাতলে সমবেত হবে। সেই সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে এঁটে ওঠা হূনের পক্ষে সম্ভব হবে না, যোদ্ধা হিসাবে তারা যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন। সুতরাং বিতাড়িত তারা হবেই, এবং তারা বিতাড়িত হওয়ার পরে—

ঐক্যের মূল্য যে কতখানি, সেটা রাজারা চোখের উপরেই দেখতে পাবেন হূনযুদ্ধে। কাজেই আশা করা যায় যে হূন-বিজয় সমাধা করে সেই ঐক্যকে তাঁরা চিরস্থায়ী রূপ দিতে উৎসাহী হবেন, প্রভাকরবর্ধনকে সম্রাট বলে স্বীকার করে নিয়ে। আনুষ্ঠানিক স্বাকৃতি না থাকলেও কার্যতঃ এখনই ত সবাই অধিরাজবৎ সম্মান দিচ্ছে তাঁকে।

এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চান প্রভাকর-বর্ধন। তাই দূত পাঠিয়েছিলেন বল্লভীপুরে। হূন-নায়ক রুদ্রসেনের সম্মুখে ঐ প্রশ্নটি রাখবার জন্য—বল্লভীর অধিকার ত্যাগ করে তিনি সদলবলে মধ্য এশিয়ায় প্রস্থান করতে রাজী কি না।

রুদ্রসেন এর উত্তর অতি সংক্ষেপে দিতে পারতেন। একটা ছোট্ট 'হাঁ' বা একটা ছোট্ট 'না' বলে। কিন্তু তা না করে তিনি অন্য একটি কাজ করেছিলেন। বলেছিলেন—"প্রশ্নটা খুব সহজ নয়। বিশেষ ভেবে দেখবার দরকার আছে। মাসখানেক বাদে আমি নিজে দূত পাঠিয়ে তারই মুখ দিয়ে থানেশ্বরপতির প্রশ্নের উত্তর দেব।"

থানেশ্বরের দূত ফিরে এসে এই বার্তা নিবেদন করল যখন, প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কী করতে পারেন তিনি? প্রতীক্ষা না করলে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়। কিন্তু ঘোষণা করলেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় না। পাঁচশো ক্রোশের ব্যবধান দুটো রাজ্যের ভিতর। থানেশ্বর থেকে অভিযান পাঠানো অনেক তোড়জোড়ের ব্যাপার। তার চেয়েও গুরুতর ব্যাপার রয়েছে—মাধবগুপ্ত গ্রহবর্মণেরা মুখে সম্মতি দিলেও সামরিক প্রস্তুতি তাঁদের রাজ্যে কিছুই হয়নি এখনো।

অতএব প্রতীক্ষা করতে বাধ্যই হয়েছেন প্রভাকরবর্ধন। ঠিক এক মাসের শেষেই দূত এসেছেন বল্লভী থেকে। প্রৌঢ় পুরুষ, প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ। বর্তমানে দূত পদবি নিয়ে এলেও বল্লভীপুরে অন্যতম মন্ত্রী বলেই এঁর পরিচয়। নাম ঈশানবর্ষ, জাতিতে হূন। কয়েক পুরুষ ভারতে বাস করে হূন-সমাজে উচ্চস্তরের ব্যক্তিরা আজকাল ভারতীয় ধাঁচেই নামকরণ করছেন সন্তানদের।

হ্যাঁ, ঈশানবর্ষ এসেছেন, এবং এসেই নিবেদন করেছেন—"মহারাজাধিরাজ! আপনি জানতে চেয়েছিলেন মহারাজ রুদ্রসেন সদলবলে ভারত ছেড়ে মধ্য এশিয়ায় চলে যেতে প্রস্তুত আছেন কি না। তিনি কিন্তু বুঝতেই পারছেন না যে ভারত তিনি ছেড়ে যাবেন কেন। তাঁর প্রপিতামহ অবশ্য মধ্য এশিয়ারই লোক ছিলেন শতাব্দী পূর্বে। কিন্তু বর্তমান মহারাজের পিতামহ জন্মগ্রহণ করেন ভারতে। পিতা ত বটেই, এবং রুদ্রসেন নিজেও নিঃসন্দেহে। আমাদের মহারাজ নিজেকে মনেপ্রাণে ভারতীয় বলেই বিবেচনা করেন। মধ্য এশিয়ায়

"কেনই বা দেবে না? ভারতবর্ষ উদার।"

এক বিঘত পরিমাণ ভূমিও মহারাজ রুদ্রসেনের আপনার বলতে নেই এখন। তার চেয়েও যা মারাত্মক অসুবিধা তাঁর পক্ষে, তা হল এই যে হূন ভাষাটি পর্যন্ত তিনি ভুলে বসে আছেন। শুধু তিনি কেন, আমরা সকলেই, যাদের পূর্বপুরুষেরা একদিন ঘোড়ায় চড়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে এসেছিল হিন্দুকুশ পেরিয়ে।"

"কিন্তু ভারতবর্ষ চিরদিন ধরে হূনকে থাকতে দেবে কেন নিজের কোল জুড়ে?" ক্রুদ্ধ প্রশ্ন প্রভাকরবর্ধনের।

"কেনই বা দেবে না? ভারতবর্ষ উদার। মা বলে যে ডাকে, পরের সন্তান হলেও তাকে নিজের করে নেবার মত স্নেহ তাঁর অন্তরে আছে। অপরাধ নেবেন না। উত্তরকুরু থেকে যে আর্যেরা একদিন এসেছিলেন, তাঁরা কি আশ্রয় পাননি ভারতে? তাঁরাও ত প্রথম বসতি স্থাপন করতে পেরেছিলেন আদিম অধিবাসীদের যুদ্ধে পরাস্ত করেই।"

"দূত, দুর্বিনীত হবেন না"—হুঙ্কার করে উঠলেন মহারাজাধিরাজ।

মহামন্ত্রী অভয় চতুর্বেদী মাঝখান থেকে হস্তক্ষেপ করলেন—"আমরা আর্যেরা বিশ্বাস করি না ও কথা। আমরা জানি যে, আর্য সভ্যতার জন্মভূমি ভারতই। কিন্তু ও সব আলোচনায় কোন লাভ হবে না। মহারাজাধিরাজ চাইছেন ভারতকে হূনমুক্ত করতে।"

"ভারত ত হূন-মুক্তই মহামন্ত্রি! হূন আর এখন নেই কেউ। বল্লভীপুরে দয়া করে চলুন একবার, দেখতে পাবেন, সেখানে আবাল-বৃদ্ধ কথা বলে গুর্জরী ভাষায়, পূজা করে দ্বারকাধীশ বাসুদেবকে, বৈবাহিক আদান-প্রদান করে প্রতিবেশী আর্য জনপদের অধিবাসীদের সঙ্গে। সত্য কথা বলতে কি, একটা ঐ জাতীয় ঘটকালির প্রস্তাব আমার মাথায়ও রয়েছে। আমার প্রভু কথাটা আমাকে নিবেদন করতে বলেছেন এখানে—"

"বিবাহ প্রস্তাব?"—ক্রোধের সঙ্গে কৌতূহল মিশে মহারাজাধিরাজের ঘৃণা-কুঞ্চিত অধরেও হাসি ফুটিয়ে তুলল।

"এই মুহূর্তেই সেটা উত্থাপন করতে দ্বিধা হচ্ছে আমার।"—বললেন ঈশানবর্ম, "ভারত ত্যাগ না করেও আমরা পারব কি না, সেটার মীমাংসা না হয়ে গেলে ও প্রশ্ন তোলা অর্থহীন হবে।"

"না, পারবেন না।"—দৃঢ় জবাব প্রভাকরবর্ধনের। স্বেচ্ছায় যেতে না চান যদি, যুদ্ধ করে আমরা পশ্চিম ভারতকে হূন-মুক্ত করব। আপনারা গুর্জরী ভাষায় কথা বলেন বলে, আর ভগবান বাসুদেবের পূজা করেন বলেই যে ভারতীয় বনে গিয়েছেন, তা নয়। আপনি ফিরে গিয়ে বলুন মহারাজ রুদ্রসেনকে—এক বৎসর আমরা অপেক্ষা

করব, যদি সেই এক বৎসরের মধ্যে চলে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি আপনারা দেন। যদি না পাওয়া যায় সেই প্রতিশ্রুতি, এক মাসের মধ্যেই রণযাত্রা করব আমরা, মুক্ত করব বল্লভীপুরকে।"

"আমি কি তাহলে ঐ বার্তা নিয়েই বিদায় হব?"—বিষণ্ণ, কিন্তু অবিচলিত দৃঢ় কণ্ঠে শেষ প্রশ্ন করলেন ঈশানবর্ষ।

"নিশ্চয়।"—মহারাজাধিরাজ অদূরে দণ্ডায়মান মাধবগুপ্তকে নিকটে আহ্বান করলেন হাতের ইশারায়। অর্থাৎ বল্লভীর দূতের সঙ্গে কথা তাঁর ফুরিয়েছে। অভিবাদন করে বিদায় নিলেন ঈশানবর্ষ। মহামন্ত্রী চতুর্বেদী তার সঙ্গে গেলেন কয়েক পদ, এবং একটু নিরিবিলিতে পৌঁছেই মৃদু কণ্ঠে বললেন—"ভদ্র ঈশানবর্ষ!"

ঈশানবর্ষ মৃদু হেসে বললেন—"বুঝেছি মহামন্ত্রি! অন্য কী প্রস্তাব আমার মাথায় ছিল, সেটা জানতে আগ্রহ হচ্ছে আপনার। কিন্তু সভাতেই যখন সেটা তোলার সুযোগ হল না, গোপনভাবে সেটা ব্যক্ত করা উচিত হবে কি না আমার পক্ষে, আমি তা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"রাজনীতিতে অধিকাংশ আলোচনাই গোপনে হয়, আঁকাবাঁকা পথে, এটা আপনার মত লোকের অজানা থাকবার কথা নয় বন্ধু!"

অতঃপর সভাগৃহের এক কোণে এক স্তম্ভ বেছে নিয়ে তারই আড়ালে দাঁড়ালেন দু'জনে। ঈশানবর্ষ কী যেন কানে কানে বললেন চতুর্বেদীর। চতুর্বেদী প্রথমে উঠলেন চমকে, তারপরে হাসলেন মুচকি হাসি, তারপর ঈশানের কাঁধে হাত রেখে তেমনি কানে কানে বললেন—"হবে না বন্ধু! তবে আশা রাখতে দোষ নেই। যুদ্ধ হয়ত হবে, কিন্তু যুদ্ধের পরে সন্ধিও ত হয়! ভেবে দেখব ততদিন। অন্য উপায় কী হতে পারে, ভেবে দেখব। করতে পারলে কাজটা হত ভাল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে বেজায়—"

নিভৃত মন্ত্রণাকক্ষে কথা হচ্ছিল সেই রাত্রেই। মহারাজাধিরাজে আর মহামন্ত্রীতে। চতুর্বেদী হিসাব দিচ্ছেন প্রভাকরকে—"মালব আনছে ত্রিশ হাজার পদাতিক, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, এক শো হাতি। মগধ থেকে পাচ্ছি ষাট হাজার পদাতিক, দশ হাজার অশ্বারোহী, ছয় শো হাতি। কর্ণসুবর্ণের সেই ভূঁইফোঁড় শশাঙ্কর কাছেও সহযোগিতা কামনা করা হয়েছিল, মহারাজাধিরাজের মনে আছে বোধ হয়। সে বলে পাঠিয়েছে, সৈন্য সে দিতে পারে না, কিন্তু দিতে পারে একজন সেনাপতি, সম্মিলিত দিগ্বিজয়বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হওয়ার মত অপরাজেয় রণশূর একটি—"

"এঁ্যা?"—মহারাজাধিরাজ এমন বিস্মিত এ কথা শুনে যে তাঁর মুখ দিয়ে "এঁ্যা" ছাড়া দ্বিতীয় শব্দ আর বেরুল না।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মহানায়ক শশাঙ্কর ধারণা যে, উত্তর ভারতে সেনাপতির মত সেনাপতি একজনই আছেন, এবং সে সেনাপতি তিনি নিজেই।"

প্রভাকরবর্ধন হাসতে গিয়েও হাসলেন না, উলটে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—"এত দম্ভ যার, সে একটা ওলট-পালট না ঘটিয়ে ছাড়বে না। ঐ শশাঙ্কর উপর সর্বদাই একটা চোখ ফেলে রাখতে হবে আমাদের।"

"অবশ্য।" জবাব দিলেন মন্ত্রী—"সবে ত কলির সন্ধ্যা, মানে শশাঙ্ক ত এখনও যৌবন পেরোয়নি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে কী দারুণ বস্তুতে পরিণত হবে, কে জানে। কিন্তু যে কথা হচ্ছিল মহারাজ! মালবে মগধে মিলে গুপ্তরা আমাদের দিচ্ছেন নব্বুই হাজার পদাতিক, পনেরো হাজার অশ্বারোহী। তার উপরে আমাদের নিজের সৈন্য—"

ব্যস্ত হয়ে প্রভাকর বাধা দিলেন—"নিজের

নিভৃত মন্ত্রণাকক্ষে কথা হচ্ছিল মহারাজাধিরাজে আর মহামন্ত্রীতে। [পৃষ্ঠা ২৯৫

সৈন্যের কথা থাকুক। ওদের আমি অভিযানে নিয়ে যাব ভেবেছেন নাকি? তারপর থানেশ্বর অরক্ষিত জেনে গান্ধারের পথে নতুন কোন বহিঃশত্রু যদি হানা দেয় পঞ্চনদে বা ব্রহ্মাবর্তে! ঐ হূনেদেরই, না শকদেরই, না সাইথীয়দেরই কে জানে কাদের এক নতুন শাখা নাকি উত্তর কুরু অঞ্চলে নতুন করে শেকড় গেড়ে বসেছে আবার—"

"দাদা! দাদা! আটিলার মত দুর্জয় নাকি সে। হ্যাঁ, মহারাজাধিরাজের বিচারবুদ্ধি সর্বদাই অভ্রান্ত। থানেশ্বর বলতে গেলে ভারতের সিংহদ্বার। একে অরক্ষিত রেখে যাওয়া চলে না। যদিও আমাদের ষাট হাজার পদাতিক আর দশ হাজারেরও কিছু কম অশ্বারোহী সবাই রাজধানীতে হাজির থাকলেও দাদার আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করতে পারবে কিনা। যদি সত্যিই দাদা করে আক্রমণ, না করাই অবশ্য সম্ভব—"

"কেন? না করা সম্ভব কেন? করবেই। একবার উত্তর কুরুতে ঘাঁটিটা পোক্ত করে নিতে পারলে হয়। তবে আমার আন্দাজ, একটা বছর অন্ততঃ লাগবে তার, ভারত আক্রমণের জন্য তৈরি হতে। ইতিমধ্যে আমি রুদ্রসেনকে খতম করতে চাই। ঘরের কানাচে এক দঙ্গল হূন যদি থাকে আমার, আমি সিংহদ্বার আগলে রেখে করব কি? সম্মুখ যুদ্ধে যখন ব্যস্ত থাকব দাদার সঙ্গে, পিছন থেকে পিঠে ছোরা বসাবে রুদ্রসেন। না, না, এক্ষুণি রওনা হতে হবে গুর্জরে এবং তা থানেশ্বরের নিজস্ব সৈন্য না-নিয়েই। ভাল কথা, গ্রহবর্মার কথা ত কিছু বললেন না?"

"বলিনি, সেখানে নানারকম অশুভগ্রহের সমাবেশ হয়েছে বলে। মহারাজাধিরাজের হবু-জামাতার সিংহাসনই শেষ পর্যন্ত রক্ষা হবে কিনা বলা শক্ত। জ্ঞাতিবিরোধ ত চিরদিনই ছিল, এবার চক্রায়ুধের সঙ্গে নাকি গোপন যোগাযোগ হয়েছে শশাঙ্কর—"

"এ সব কী বলছেন আপনি? কবেকার খবর এসব? আমায় এত দিন জানাননি ত!"

"খবর সবে কাল রাত্রির। চরমাগুলিক শ্যেনসুন্দর কালই রাজধানীতে পৌঁছোল কর্ণসুবর্ণ, পাটলিপুত্র এবং কনৌজ ঘুরে। সকালে প্রথমেই উঠল ঈশানবর্মের ব্যাপার, কাজেই একটু দেরি হয়ে গেল রাজাধিরাজকে জামাতা বাবাজির সংবাদ জানাতে।"

প্রবীণ মন্ত্রী চতুর্বেদীই একমাত্র লোক, যিনি রাশভারী রাজার সঙ্গে সময় বিশেষে রসিকতা করতে সাহস পান।

রাজাধিরাজ নিস্তব্ধ। তারপর মুখ খুলেই মন্তব্য করলেন—"আগে রুদ্রসেন, না আগে শশাঙ্ক, আগে কার সঙ্গে বোঝাপড়া করি, বলুন ত! কিন্তু

সে কথা থাকুক, চক্রায়ুধকে শূলে বসাচ্ছে না কেন গ্রহবর্মা ?"

"চক্রায়ুধকে বসাবার মত শক্ত শূল কনৌজের কামারেরা গড়তে পারছে না বলে"—দ্বিতীয় দফা রসিকতা মহামন্ত্রীর—"সে সর্বদা সুরক্ষিত। শুধু দেহরক্ষী দিয়ে নয়, জনমতের শক্তি দিয়ে। সামন্তেরা বেশীর ভাগই চক্রায়ুধের দলে। তাই বলছিলাম, গ্রহবর্মার ভাগ্যে ভারি দুর্গ্রহের প্রকোপ চলছে। মহারাজাধিরাজ এদিকে বল্লভী অভিযান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে না পড়লে অবশ্য গ্রহবর্মার ভয় কিছু ছিল না। চক্রায়ুধকে বসাবার জন্য আমরাই একখানা শূল পাঠিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু এখন তা হয় কী করে? ওদিকে মনোযোগ দিতে গেলে বল্লভীকে আর শায়েস্তা করা যায় না।"

মহারাজাধিরাজ চিন্তামগ্ন।

এদিকে খানিকটা চুপ করে থেকে চতুর্বেদী যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করতে লাগলেন—"রাজ্যশ্রী মায়ের ভাগ্যে কী যে আছে, কে জানে! এই টালমাটালের যুগে রাজাদের যেমন শক্ত লোক হওয়া দরকার, গ্রহবর্মা ঠিক তেমনটি নন। ওর চেয়ে বরং—"

"কী বরং?" রাজা কান খাড়া করে উঠেছেন।

"না, না, মহারাজ! ও কিছু নয়—" মন্ত্রী যেন তটস্থ একেবারে।

"কিছু নয় মানে?" প্রভাকর রেগে উঠলেন—"আমি আর আপনাকে চিনি না? ওর চেয়ে বরং কী? গ্রহবর্মার চেয়ে বরং? কে সেই বরংটি, জানতে চাই। রাজ্যশ্রীর বিয়ে আর কার সঙ্গে দিলে ভাল হত ওর চেয়ে? কে আর যোগ্য-পাত্র আছে শুনি?"

"কেউ নেই, কেউ নেই। কিংবা বলতে পারি, থেকেও নেই।"—মন্ত্রী পূর্ববৎ তটস্থ।

"থেকেও নেই? কেন নেই? থেকে থাকে যদি ত নাম করেননি কেন এতদিন? আর আজই বা বলছেন কেন যে থেকেও সে নেই?" মহারাজের গলা চড়ছে ক্রমশঃ।

"আজই বলছি কেন, সেই প্রশ্নেরই জবাব আগে দিই। কারণ আমার ত মনে হয় ঐ এক জবাবেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন মহারাজ। আজই বলছি এই জন্য যে আজই সেই ব্যক্তির নাম আমি শুনেছি। যে নাকি রাজ্যশ্রী মায়ের যোগ্য বর হয়েও অবাঞ্ছিত বলে গণ্য হবে শুধু এই কারণে যে সে-সে-সে—"

"সে কী? কী সে?"—মহারাজ যুগপৎ বিস্মিত, ক্রুদ্ধ।

"সে আমাদের শত্রু—"

"কেন? কী কারণে শত্রু? কে সে? শশাঙ্ক?"

"না, শশাঙ্ক নয়, রুদ্রসেন। শুধু শত্রু নয়, হূন। কিংবা বলা যায় যে হূন বলেই শত্রু।"

আবার বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ রাজাধিরাজ। মন্ত্রীও আর স্বগতোক্তি করছেন না। একবার যা করেছেন, তাই পরিপাক করতেই সময় লাগবে রাজার, তা বোঝেন চতুর্বেদী।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে রাজা বললেন—"ঐ দূতই কথাটা বলে গিয়েছে, নয়? বল্লভীর ঐ ঈশানবর্ম? দেখলাম তখন, ওকে বিদায় দেওয়ার জন্য আপনি সঙ্গে সঙ্গে গেলেন খানিকটা। পছন্দ হয়নি তখন, শত্রুর দূতকে অত অতিরিক্ত সৌজন্য দেখানো—"

"কিন্তু এখন?"—প্রশ্ন করলেন মন্ত্রী।

রাজা বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন—"ওর সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই জানি যে ও হূন। মানুষ হিসাবে ও কী রকম জানি না, জানবার দরকারও নেই।"

বলতে বলতে রাজা উঠে গেলেন। আহারের

সময় হল, তার আগে শিবপূজা আছে, অনেক সময় ওতে লেগে যায়।

আরও একমাস পরে। বল্লভীর উপকণ্ঠে পৌঁছে রাজাধিরাজ প্রভাকরবর্ধন শিবির স্থাপন করছেন। প্রাচীরে ঘেরা সুরক্ষিত নগরী। ঘোড়া ছুটিয়ে আসব আর ভিতরে ঢুকে যাব—উপায় নেই তার। হয় দীর্ঘদিন অবরোধ করে বসে থাকতে হবে, আর না হয়ত প্রাচীর লঙ্ঘন করে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। রাজা ভাবছেন যথাকর্তব্য পরে স্থির করা যাবে, আপাততঃ সৈন্যরা বিশ্রাম করুক দুই দিন। পথের কষ্টে তারা অবসন্ন।

শিবির স্থাপিত হচ্ছে। রাজা পায়চারি করছেন রাজপথে। প্রাচীর থেকে অনেকটা দূরে, তীরন্দাজদের নাগালের বাইরে। তা ছাড়া, দেহরক্ষী ত চারিদিকেই আছে।

রাজার শিবির পড়ছে নগরের উত্তর দ্বারে। দক্ষিণ প্রাচীরের কাছ থেকে এক সেনানায়ক এসে উপস্থিত, সঙ্গে একদল সৈনিক ও একজন বন্দী। বন্দীর চেহারা ভারতীয়দের মত নয়। খর্ব নাসা, অল্প লাল দাড়ি, গায়ের রঙ প্রায় হলদে। পোশাক অবশ্য ভারতীয়ের, কিন্তু এ পোশাক পরতে বন্দী যে অভ্যস্ত নয়, তা তার আড়ষ্ট ভাব দেখলেই সন্দেহ হয়।

ও নগরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় থানেশ্বরী সেনা এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে ফেলল। নগর দ্বার আগেই রুদ্ধ হয়েছে শত্রু ভয়ে, তা নইলে লোকটা অনেক আগেই ঢুকে বসে থাকতে পারত।

যা হোক, বন্দীর কাছে চিঠি পাওয়া গেল একটা। এ কী ভাষা? রাজা পড়তে পারলেন না চিঠি। চতুর্বেদী সঙ্গে আসেননি, থানেশ্বরের নিরাপত্তার জন্য তাঁকে সেখানেই থেকে যেতে হয়েছে। তিনি অবশ্য নানা ভাষা জানেন। সঙ্গে থাকলে—

সেই যখন, তখন খোঁজা হোক, হূন-ভাষাভাষী কে আছে সৈন্যদলে। এটা যে হূন-ভাষা, তাও সন্দেহ মাত্র রাজার।

খবর পেয়ে মাধবগুপ্ত এলেন পশ্চিম প্রাচীর থেকে। মগধের রাজা, প্রভাকরের মাতুলপুত্র এবং একান্ত শুভানুধ্যায়ী। ইনি জানেন হূন-ভাষা। চিঠির উপর চোখ বুলিয়েই প্রভাকরকে নিয়ে গেলেন একান্তে—"এ চিঠি উত্তর কুরু বিজেতা হূনপতি দাদ্দার। লিখেছেন বল্লভীপতি রুদ্রসেনকে।"

"বল কী? কী লিখেছেন?"

"আমাদের অভিযানের কথা দাদ্দার কানে পৌঁচেছে। রুদ্রসেন নিজে সাহায্য প্রার্থনা করেননি তাঁর কাছে, এতে তিনি ক্ষুব্ধ। লিখেছেন একই হূন-রক্ত যখন দাদ্দা আর রুদ্রসেন দুজনারই ধমনীতে বহমান, তখন রুদ্রসেন সাহায্য চান বা না চান, দাদ্দা সাহায্য করতে বাধ্য। তিনি শীঘ্রই আসছেন অপরাজেয় হূন-বাহিনী নিয়ে।"

"সর্বনাশ!" রাজার মুখ কালো হয়ে গেল।

বন্দীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মাধবগুপ্ত জানলেন —দাদ্দা একমাত্র তাকেই যে পাঠিয়েছেন পত্র দিয়ে তা নয়। পর পর চারজন পত্রবাহক এসেছে, একই পত্র নিয়ে। সে নিজে হল তৃতীয় ব্যক্তি। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রবাহক নগরে প্রবেশ করতে পেরেছে কি না, তা সে জানে না।

সে জানে না, কিন্তু প্রভাকরবর্ধন জানলেন। জানলেন সেই রাত্রেই। জানলেন যে তারা নগরে ঢুকে পত্র দিয়েছিল রুদ্রসেনকে।

কী করে জানলেন? রাত্রির অন্ধকারেই দুজন হূন পাঁচিল টপকে বেরিয়েছিল নগর থেকে, নিঃশব্দে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল থানেশ্বরী

শিবিরের পাশ কাটিয়ে। সতর্ক প্রহরীরা ধরে ফেলে তাদের। তারা দাদ্দারই প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রবাহক। তারা প্রভুর কাছে ফিরে যাবার জন্য বেরিয়েছিল। প্রমাণ, তাঁদের দুজনেরই কাছে দু'খানা চিঠি। একই বয়ান দুটো চিঠির। লেখক রুদ্রসেন।

মাধবগুপ্ত পড়লেন চিঠি—"দিগ্বিজয়ী দাদ্দা মহারাজকে তাঁর সদয় প্রস্তাবের জন্য অশেষ ধন্যবাদ দিই আমি। কিন্তু হূন-বংশে জন্ম হলেও তিনপুরুষ ধরে ভারতীয় আমরা। থানেশ্বরীদের সঙ্গে আমার কলহ ঘরোয়া কলহ মাত্র। ঘরের কলহে বাইরের কাউকে ডাকব না। আপনি দয়া করে ভারত-ভূমির বাইরে থাকলেই আমি ধন্য হব। যদি কখনও ভারতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেন, থানেশ্বরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমি রুখব আপনাকে। আমার সেটা কর্তব্য।"

জিজ্ঞাসাবাদের ফলে পত্রবাহক দুজন যে সব কথা প্রকাশ করে ফেলল, তাতে প্রভাকরের মনে আর সন্দেহ রইল না যে, সত্যই দাদ্দা ভারতে আসতে চেয়েছেন, এবং সত্যই রুদ্রসেন প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁর সাহায্যদানের প্রস্তাব।

পরদিনই শ্বেতপতাকা নিয়ে মাধবগুপ্ত প্রবেশ করলেন বল্লভীপুরে, এবং সন্ধির প্রস্তাব করলেন রুদ্রসেনের কাছে। রুদ্রসেন বিস্ময়ে নির্বাক্—"যুদ্ধ করতে এসে গোড়াতেই সন্ধি করতে চাইছেন, এ কেমনধারা ব্যাপার?"

মাধবগুপ্ত হেসে উত্তর দিলেন—"যুদ্ধ করতে এসেছিলাম এক হূন-রাজার সঙ্গে। তা এখানে দেখছি, রাজা যিনি আছেন, তিনি দ্বিতীয়তঃ হূন হলেও হতে পারেন, কিন্তু প্রথমতঃ তিনি খাঁটি ভারতীয়।"

সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করে বল্লভী থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার আগে প্রভাকর হাত ধরে বললেন রুদ্রসেনকে—"বৎস! তোমায় কন্যাদান করতে পারলে আমি চরিতার্থ হতাম। কিন্তু তা ভাগ্যে নেই। তার বাগ্‌দান হয়ে রয়েছে অন্যত্র। কিন্তু তোমাকে আমি আত্মীয় জ্ঞানই করব আজ থেকে। আমার পুত্ররা আছে, তাদের পুত্র কন্যা হবে, তোমারও হবে। বৈবাহিক সম্বন্ধ যাতে সেই পর্যায়ে স্থাপিত হতে পারে, সে আদেশ আমি দিয়ে যাব পুত্রদের।"

চোখের ভুল

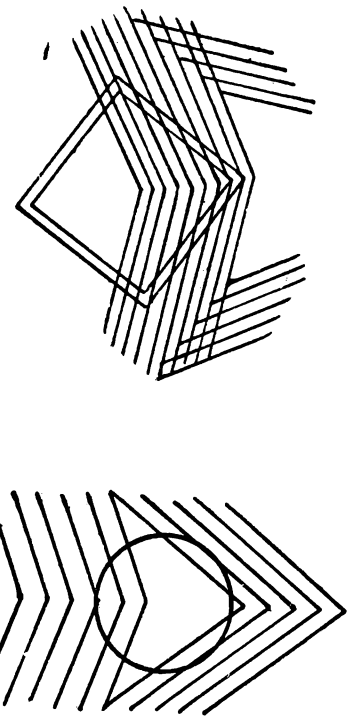

উপরের ছবি দুটি দেখ। কোনাকুনি ঘন লাইনগুলির মধ্যে একটি ছবিতে চৌখুপী ও অপরটিতে একটি গোলাকার বৃত্ত আঁকা আছে। চৌখুপী ও বৃত্তটি বাঁকাচোরা দেখালেও আসলে লাইন কিন্তু ঠিকই আছে।

হাঁদা ভোঁদার

পুরস্কার প্রাপ্তি

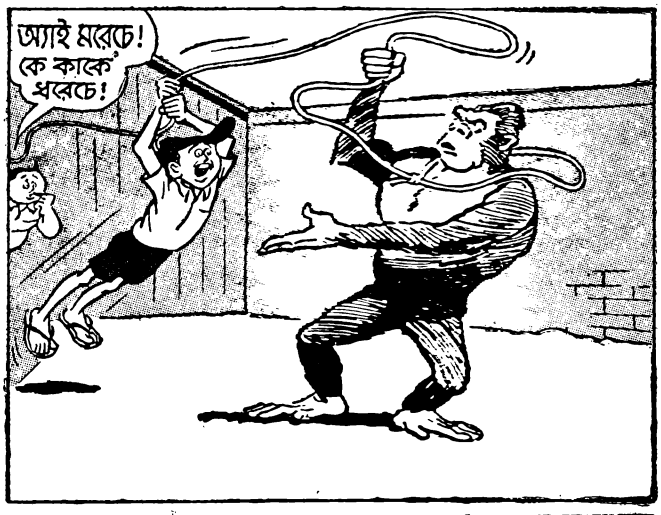

কিছুক্ষণ পরে
হিঃ হিঃ! দ্যাখ্ ভোঁদা, বাছাধন কেমন আমার ফেলে আসা কলার লোভে আস্তে আস্তে ফাঁদের দিকে এগোচ্ছে!
কিন্তু হাঁদা—
রাখ তোর কিন্তু। দড়ির এক ঝটকায় দ্যাখ্ কেমন অনায়াসে বাক্সবন্দী করে ফেললুম!
এই যে সে ওই বাক্সের নীচে আছে!
সার্কাস
মরেচে! এযে পিসেমশাই!
এ তো গাঁটু নয়!
দাঁড়া, একবার তোকে ধরি!
ওরে বাবা! কোথায় লুকোই!
ওরে বাবারে! এযে সেই আসল গরিলা গাঁটু! আমার বিছানায় এতক্ষণ শুয়ে!
ওরে গেছিরে! সামনে পিসেমশাই পেছনে গাঁটু। ভোঁদা, তুই ওর হাঁটু দুটো কোনরকমে আটকে দে না রে!
উম, আপ, গুপ! (মানে—ধরতে পারলে আড়ং ধোলাই লাগবো!)

অপরাজেয় টারজান

সব্যসাচী

১

প্লেনখানা পড়ছে। কাৎ হতে হতে, ঘুরপাক খেতে খেতে পড়ছে। ঐ একটা আগুনের শিখা রুচ্ছে লকলক করে। এক্ষুণি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে আগাপাস্তলা। পুড়ে মরবে যাত্রীরা। যাত্রী? প্লেনের ব্যাপারে টারজান যদিও তেমন বেশী কিছু জানে শোনে না, তবু বিমানখানার ছিমছাম চটকদার চেহারা দেখে ওর আপনা থেকেই মনে হচ্ছে যাত্রীবাহী বিমানই বোধহয় হবে এখানা। কোথায় যাবে? কঙ্গোর দিকে যেতে পারে। আসছে হয়ত নাম্বিয়া বা সাউথ আফ্রিকা থেকে।

ইস্! দেখতে দেখতে গোটা প্লেনটা পরিণত হয়ে গেল একটা নিশ্ছিদ্র অগ্নিগোলকে। একটা প্রাণীও বাঁচবে না। মাটিতে পড়বে যখন, তখন নয়নাভিরাম বিমানখানার আকৃতি হবে একটা দোমড়ানো মোচড়ানো বিরাট ধাতুপিণ্ডের মত। তা থেকে উদ্ধার করে আনবার মত জিনিস অবশিষ্ট থাকবে না কিছুই তাতে। না মানুষ, না দ্রব্যসামগ্রী। অকারণ যাওয়া ওদের সাহায্যে।

তবু, টারজানের স্বভাব, তার জ্ঞানগোচরে কোথাও কারও কিছু অনর্থ ঘটলে সে যাবেই ধেয়ে সেখানে। বিপন্নের ত্রাণে নিয়োগ করবে তার দেহের অতিমানুষিক শক্তি। তাই প্লেন পড়তে শুরু করা থেকে, তাতে আগুন জ্বলে উঠবার আগেই বলতে গেলে, টারজান চলমান হয়েছে। শুয়েছিল এক বিশাল বাওবাব গাছের চারতলার তেডালায় পরমানন্দে। তড়াক করে উঠে পড়েছে সেই সুখশয্যা থেকে, আর দক্ষিণমুখী ডালখানার উপর দিয়ে কাঠবিড়ালের মত স্বচ্ছন্দে দৌড়ে গিয়ে দিয়েছে লাফ, পায়ের নীচের বিশ-পঁচিশ ফুট চওড়া শূন্য দেশটুকু অতিক্রম করবার জন্য। ঐটুকু ব্যবধানের ওপারেই অন্য এক মহা-মহীরুহের প্রলম্বিত শাখার অগ্রভাগটা পাওয়া যাবে পায়ের তলায়। সে ডাল থেকে অন্য ডালে,

সে-গাছ থেকে অন্য গাছে, এই ত তোফা সুগম রাজপথ টারজানের! লর্ড গ্রেস্টোকের জাব্বাজোব্বা দেহে চাপিয়ে লণ্ডনের রাজপথে মোটর ভ্রমণের সময়ও নিজেকে তেমন নিরাপদ বিবেচনা করতে পারে না টারজান, যেমন পারে লম্ফে লম্ফে মহারণ্যের মাথায় মাথায় এইভাবে অন্তরীক্ষ-পরিক্রমার সময়, সিংহচর্মের কটিবাস পরে আর এক কাঁধে ধনুক আর অন্য কাঁধে কুণ্ডলিপাকানো একগাছা ঘাসের দড়ি নিয়ে।

দূর কম নয়। চার পাঁচ মাইল হবে নিশ্চয়ই। তার উপরে গেরো দেখ। পেছনটা পড়েছে অরণ্যসীমা থেকে খানিকটা দূরে, পাহাড়ের এলেকায়। বেশী উঁচু পাহাড় অবশ্য নয় এগুলি। তবু কিছুটা সময় ত লাগবেই তার মাথার উপর উঠতে! মাথায় না উঠলে বুঝবে কেমন করে যে ঠিক কোন্ জায়গাটিতে পড়েছে বিমানখানা! কোন নীচু পাহাড়ের গায়ে মাথায় পড়ে থাকতে পারে, অথবা কোন উপত্যকায় বা খদের ভিতর। কী ভাবে কী কাজে অগ্রসর হতে হবে, তা ত অকুস্থলে পৌঁছোবার আগে কিছুই বোঝা যাবে না!

যা হোক, লাফিয়ে লাফিয়ে বনের এলেকা এক সময় পার হয়ে এল টারজান। পাহাড় তেমন খাড়া নয়। ঢালু গা বেয়ে তার মাথায় উঠতেও খুব বেশীক্ষণ লাগল না তার। পড়ন্ত বিমান প্রথম দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ার পরে ঘণ্টা খানিকের মধ্যেই অনুচ্চ পাহাড়-বেষ্টনীর মাঝখানে এক অগভীর উপত্যকায় বিধ্বস্ত যানখানাকে আবিষ্কার করল টারজান।

আগুন তখনও জ্বলছে তার এখানে ওখানে। পড়বার সময়ে বিমানটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে সারা উপত্যকা জুড়ে। তার মধ্যে তিনটে টুকরোতেই সে-আগুনের দাপট বেশী। সে সব টুকরো থেকে মানুষের সাড়াও পাওয়া যায় না একেবারেই। কিন্তু দুটো টুকরো, তার একটাতে আগুন এখন নিবন্ত, অন্যটাতে মনে হয় ছোঁয়াই লাগেনি অগ্নিশিখার, সেই দুটো থেকে মানুষের কথা শুনে কান খাড়া করে দাঁড়াল টারজান।

কথা? না, ভুল বলা হল। নিবন্ত হলেও আগুন যেখানে ধিকি ধিকি জ্বলছে এখনো, সেখান থেকে আসছে একটা আর্তনাদ। একটানা একটা "জ্বলে মলাম, বাঁচাও, কে আছ, বার কর আমায়' জাতীয় মর্মান্তিক আবেদন। আর আগুনের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছে প্লেনের যে ভগ্নাংশটা, তা থেকে আওয়াজ আসছে একাধিক কণ্ঠে উল্লসিত উচ্চ হাসির। জয়গর্বের হাসি সেটা, বিদ্রূপের হাসি সেটা—শাণিত, নিষ্ঠুর।

টারজানের জীবন ঘটনাবহুল। দেশে দেশে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা তার হয়েছে, নানা অপ্রত্যাশিত পরমাশ্চর্য সব পরিস্থিতিতে। আজকের এ-অভিজ্ঞতাও কম চমকপ্রদ নয় তার কোনটা থেকে। মৃত্যুযাতনায় ছটফট করতে করতে এক হতভাগ্য এদিকে করছে হাহাকার, আর সেই মৃত্যু-পথযাত্রীকে ব্যঙ্গ করে পৈশাচিক আনন্দে হেসে ফেটে পড়ছে তারই কোন কোন সহযাত্রী! এ সহযাত্রীরা কী জাতীয় মানুষ?

অথচ এই সহযাত্রীদেরও ত ঠিক ঐ রকমই বিপদ ঘটবার কথা ছিল! অত বড় বিমানখানা। তাতে কম বেশী একশো জন যাত্রী ত নিশ্চয়ই থেকে থাকবে। এক নজরে টারজন যা বুঝতে পারছে, তাতে সেই একশো লোকের মধ্যে সবাই হয়েছে যমদ্বারের অতিথি, মাত্র দুটি তিনটি লোক ছাড়া। একটি ঐ জ্বলন্ত প্লেনখণ্ডের ভিতরে আটক হয়ে পড়েছে জাঁতাকলে ইঁদুরের মত, আর অন্য একটি বা দুটি বা তিনটি লোক রয়েছে ঐ দ্বিতীয় খণ্ডে, আগুন যাতে লাগেনি! আটক ছাড়া মুক্ত তারাও নিশ্চয়ই নয়। বেরিয়ে আসবার উপায়

ঝুরো বালি আঁজলা ভরে ভরে ছুঁড়ে মারতে লাগল টারজান আগুনের উপরে।

থাকলে ত আসতই এতক্ষণ! এ অবস্থায় কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারলে নিশ্চয়ই তা করে! অবস্থাগতিকে সেটা না-ও পেরে ওঠে যদি, সমবেদনা অন্ততঃ জানায়! আর এখানে টারজান এ কী দেখছে? সমবেদনার বদলে নির্মম ব্যঙ্গ, হাসি? এরা মানুষ না রাক্ষস?

রাক্ষস বল, দানব বল, পিশাচ বল, ইতর-মনোবৃত্তির মানুষ টারজান এ জীবনে ঢের দেখেছে। আজও তেমনিই আর এক শ্রেণীর ইতরের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হল তাকে। দাঁড়ানোটা রুচিকর নয় টারজানের পক্ষে। নিজে সে দেহে মনে অণুতে পরমাণুতে সৎ ও মহৎ। নীচ নিকৃষ্ট কিছু দেখলে মনটা তার সঙ্কুচিত হয়। তাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হলে তিলার্ধ তৃপ্তি পায় না সে।

অন্তরে বিস্ময় বিরক্তি যত রকম বা যত প্রবলই হোক, নীরবে দাঁড়িয়ে কালক্ষেপ করার পাত্র টারজান নয়। সঙ্গিন মুহূর্তে সে এসে পড়েছে। আগে যারা পুড়ে মরেছে, তারা ত মরেছেই। কিন্তু এখন ঐ যে অভাগা চেঁচিয়ে মরছে আগুনে পুড়তে পুড়তে, টারজানের দেহে জীবন থাকতে সে ত ওভাবে ওকে মরতে দিতে পারে না! ওর আর্তনাদ কানে যাওয়ার দুই মিনিটের মধ্যে টারজান সেই জ্বলন্ত টুকরোটার উপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। উপত্যকার মাটিতে বালির ভাগ খুব বেশী। নিজের কটি থেকে ছোরা নিয়ে তাতেই সেই বালি খুঁড়ে আলগা করে ফেলল অনেকখানি জায়গার, তারপর সেই ঝুরো বালি আঁজলা ভরে ভরে ছুঁড়ে মারতে লাগল আগুনের উপরে। আগুন এখানে আগেই নিবে এসেছিল, বালি চাপা পড়ে এখন তার আর অস্তিত্ব রইল না।

কিন্তু ওদিক থেকে ওরাও কী চেঁচামেচি করছে? ঐ যারা এতক্ষণ অট্টহাস্য করছিল আনন্দে? বালি ছুঁড়তে ছুঁড়তেই টারজান ওদের বক্তব্যটা বুঝবার চেষ্টা করছে। ইংরেজীই বটে ওদের জবান, কিন্তু আফ্রিকার কোন কোন জংলী-মহলে দেশী ভাষার আধাআধি ভেজাল দিয়ে তৈরি হয়েছে ইংরেজীর যে সব বন্য সংস্করণ, এটি সেই বত্রিশ বুলিরই অন্যতম একটি। টারজান সে বত্রিশের ভিতর ত্রিশটার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। বরাতজোর যে, সেই ত্রিশটার ভিতর এদের এটাও পড়ে গিয়েছে। অল্প চেষ্টাতেই ওদের কথার মর্ম উদ্‌ঘাটন সম্ভব হল—'কী করছ তুমি উজবুক! কাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছ? দুনিয়ার সেরা পাষণ্ড ঐ পুড়ে মরছে ভগবানের রোষানলে। খবরদার! ওকে উদ্ধার করতে যেও না। ও একটা

বিবেকহীন নারকী খুনে ঘাতক। শুধু ঘাতক হলেও বা কথা ছিল, সেই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকও। ওকে পুড়েই মরতে দাও। তুমি বরং এদিকে এসো, আমরা বেরুতে পারছি না এই খাঁচাটা থেকে। আমাদের এ দশাও ত ঘটিয়েছে ঐ নারকুণ্ডা সর্দার আর তার সঙ্গের লোকজনেরা। প্লেন ধ্বংস হল ত ওদেরই জন্যে—'

অনর্গল! অনর্গল ওরা চালিয়ে যাচ্ছে ওদের কুৎসাকীর্তন আর অভিসম্পাতের পালা। টারজান কান দিচ্ছে না তাতে, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হয়। কান ঠিকই দিচ্ছে। কিন্তু তার দরুন হাতের কাজ বন্ধ হচ্ছে না তার। ওদের গালিগালাজ শেষ হওয়ার আগে এদিকে আগুন নিভে গেল একেবারে। টারজান সাবধানে উঠে পড়ল সেই পোড়া প্লেনের টুকরোটার ভিতরে। নারকুণ্ডা সর্দার আর বুঝতে পারেনি, কিছুক্ষণ থেকে তার কান্নাকাটি আর শোনা যাচ্ছিল না। এখন উপরে উঠে টারজান দেখে, সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে অতিরিক্ত ধোঁয়া গিলে ফেলার দরুন। তার গায়ের আধপোড়া জামা কাপড় তখনও ধোঁয়াচ্ছে! না জানি সেগুলি খুলে নিলে কি চেহারাই চোখে পড়বে ওর দগ্ধ দেহের!

টারজান সাবধানে ওকে পাঁজাকোলা করে খাঁচার বাইরে নিয়ে এল।

খুলে নেওয়া? সম্ভব নয়। প্যান্ট, কোট জাতীয় পদার্থ অজ্ঞান মানুষের গা থেকে খুলে নেওয়া যে কী দুঃসাধ্য, তা সে চেষ্টা যে না করেছে তার পক্ষে আন্দাজ করাই শক্ত। কাজেই সে চেষ্টা করল না টারজান। ছোরা দিয়ে লম্বালম্বি চিরে ফেলল পরিচ্ছদটা। তারপর ছেঁড়া টুকরোগুলো দেহ থেকে খুলে নেওয়া অপেক্ষাকৃত সোজা হল।

উঃ, বীভৎস দৃশ্য! পুড়েছে, ফোস্কা হয়েছে, টুকরো টুকরো চামড়া উঠে এসেছে জামা ছাড়াবার সময়। মুখের একপাশে দগদগে পোড়া ঘা। একটা চোখ গলে গিয়েছে। একে বাঁচাবার চেষ্টা কি টারজানের পক্ষে সম্ভব? সে ত ডাক্তার নয়। আর তার হাতের কাছে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র, ইনজেকশনও নেই কিছু!

ওদিকে খাঁচার ভিতরে অবরুদ্ধ লোক কয়েকটা কাকুতি মিনতি শুরু করেছে ততক্ষণে—"ওহে ও সদাশয় বনচর ভদ্রলোক! যে বাঁচবে না, তাকে নিয়েই ব্যস্ত রইলে, আমাদের ত দেখছ না একবারও? আমরা পুড়িনি বটে, কিন্তু অল্প-বিস্তর জখম হয়েছি তিনজনেই। বিশেষ করে এই মহিলাটির ত সেই থেকেই রক্ত ঝরছে পা থেকে। এমনভাবে খানিকটা ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে আমাদের সামনে, বেরুবার রাস্তা নেই আমাদের।"

টারজান দেখল কথাটা ন্যায্য। বিশেষ করে ঐ মহিলার কথা যা বলছে। রক্ত ঝরছে। সে রক্ত টারজান অনায়াসেই বন্ধ করে দিতে পারে। না দিলে সেটা হয় নিষ্ঠুরতা। পাতা-লতা যখন হাতের নাগালেই আছে—

সে এগিয়ে গেল এই দ্বিতীয় প্লেনখণ্ডের দিকে, যার ভিতর থেকে চেঁচিয়ে মরছে বন্দী বিমান-যাত্রীরা। সত্যিই ছাদের একাংশ নুয়ে পড়েছে তাদের সমুখে। পিছনে ডাইনে বাঁয়ে ত প্লেনের ধাতু-প্রাচীর অক্ষতই রয়ে গিয়েছে, কাজেই কোন দিক দিয়েই আর বেরুবার উপায় নেই অভাগাদের। ভাঙ্গা ছাদের টুকরো সরাবার চেষ্টা ওরা তিনজনে আগেও না করেছে, তা নয়, নড়াতে পারেনি একচুলও। টারজান গিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে সেই নুয়ে পড়া ছাদের টুকরোটাকে উঁচু করে ধরল ফুট তিন চার—"হামা দিয়ে তোমরা বেরিয়ে এসো এইখান দিয়ে—"

"ওটাকে একেবারে হটিয়ে দেওয়া যাবে না?" —বলল ওদের একজন—"উপরে তুলে বা পাশে

টারজান ছাদের টুকরোটাকে উঁচু করে ধরল। [পৃষ্ঠা ৩০৫

ঠেলে? এখানে কিছু মালপত্র রয়েছে, খুবই ভারী জিনিস, এটুকু ফাঁক দিয়ে টেনে বার করা ত শক্ত হবে—"

"মালপত্র?"—টারজানের কথায় সুরে প্রকাশ পেল অবিমিশ্রিত তাচ্ছিল্য—"কোথাকার বোকা হে তোমরা? জানে মারা পড়তে বসেছ, বাঁচবার চেষ্টার আগে মালপত্র বাঁচাবার কথা ভাবতে বসলে? না, ভাঙ্গা ছাদ পাশে ঠেলবার কোন উপায় নেই। উপরে টেনে তোলা যেতেও পারে, আমি যদি আভাঙ্গা ছাদের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে টানাটানি করি। কিন্তু ওদিকে ঐ অভাগা কা নাম বলছিলে? নারকুণ্ডা? হ্যাঁ, নারকুণ্ডার গায়ে ওষুধ লাগাতে আর দেরি করা উচিত নয়। এ অঞ্চলে, বিষাক্ত মাছি আছে একরকম। কাটা পোড়া যে কোন ঘায়ে সে মাছি যদি বসে একবার, সে রোগীকে বাঁচানো ভগবানেরও অসাধ্য হবে।"

"ও এমনিও বাঁচবে না"—জোর দিয়ে বলল এ পক্ষের মুখপাত্র—"আর তার চেয়ে বড় কথা শোনো, ওর বাঁচা উচিতও নয়। ও যে কত বড় পাপিষ্ঠ, যে কোন সভ্যদেশের আদালতে ওকে হাজির করে দিলে এক্ষুণি ওর ফাঁসির হুকুম হয়ে যায়—"

টারজান বিরক্ত হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত স্বার্থপর, দুর্জয় কুঁদুলে এই তিনটি লোক। এদের সঙ্গে তর্ক করার সময় টারজানের নেই। নারকুণ্ডাকে বাঁচাতে হলে এক্ষুণি, এক্ষুণি তার সারা গায়ে মুলাংমুচকো লাগানো দরকার। গাছ নিশ্চয়ই আছে ধারে কাছে। আফ্রিকার জঙ্গলে এমন কোন স্থান টারজান দেখেনি, যেখানে নেই মুলাংমুচকো। বলতে গেলে এ মহাদেশের আদিবাসীদের আদ্ধেক অসুখেই একমাত্র ওষুধ এই মুলাংমুচকো। একমাত্র এবং অমোঘ।

টারজান বিরক্ত হয়ে উঠেছে। রুক্ষস্বরেই বলে উঠল—"তোমরা বেরুতে হয় ত বেরোও। মাল পরে বার করলেও চলবে।"

"তা কি হয়? এ যে কত দামী মাল—"

আর কোন মতেই ধৈর্য রইল না টারজানের। ছাদের ভাঙ্গা টুকরা, যেটা সে উঁচু করে ধরে ছিল দেহের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে, সেটা সে দড়াম করে ফেলে দিল আবার, খাঁচায় দোর বন্ধ হল পূর্ববৎ।

"আঁ—আঁ—আঁ—এ কী? এ কী?"—আর্তনাদ ওদের সমস্বরে!

"মাল আগলেই বসে থাক তোমরা। যখন বুঝতে পারবে যে হীরে হোক, মুক্তো হোক, প্রাণের চেয়ে বেশী দামী কিছুই না, তখন ডেকো

আমাকে, আবার দরোজা খুলে দেব। আপাততঃ আমি যাচ্ছি নারকুণ্ডার প্রাণটা বাঁচাতে।"

খলখল করে এইবার একচোট হেসেও নিল টারজান—"খাঁচাটা বেশ শক্ত আছে তোমাদের। এখানে সিংহের উপদ্রব খুব বেশী। তা ও খাঁচা থেকে সিংহেরাও টেনে বার করতে পারবে না তোমাদের।"

"সিংহ!" সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠল ওরা তিনজন। কিন্তু সে-আর্তনাদের জবাবে সান্ত্বনা দেবার জন্য টারজান আর ওখানে দাঁড়িয়ে নেই, সে দ্রুত চরণে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে নিকটতম পাথুরে চাঙড়টার আড়ালে। শুধু হাতে যায়নি, নারকুণ্ডা সর্দারের হতচেতন দেহটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গিয়েছে যাওয়ার সময়। খাঁচার ভিতরকার তিনটি নরনারী স্তম্ভিত হয়ে দেখেছে—দশাসই জোয়ান নারকুণ্ডার আড়াইমনি বপুটাকে একটা বালিশের মত অনায়াসে মাটি থেকে তুলে কাঁধে ফেলল এই কৌপীনসম্বল বনচর দৈত্যটা!

টারজান অন্তর্হিত হয়েছে, কিন্তু তার কথা নিয়েই আলোচনা চলছে খাঁচার ভিতরকার এই তিন প্রাণীর। প্রশ্ন অনেক জাগছে ওদের মনে, সন্তোষজনক উত্তর মিলছে না কোনটারই। প্রশ্ন অনেক—যথা কে এই প্রায়-নগ্ন শালপ্রাংশু পুরুষ? আফ্রিকার অরণ্যে ও কী করছে, যদিও জাত্যংশে ও স্পষ্টতঃই ইউরোপীয়? ইংরেজ ও? মনে ত হয় ইংরেজ বলেই, কারণ ইংরেজীতে কথা বলে খাঁটি ইংরেজের মতই। খাঁচার বন্দীরা নিজেরা যে-জাতির লোকই হোক না কেন, ইংরেজ ত দেখেছে চর্মচক্ষে! কথাও শুনেছে তাদের।

মহিলাটি কাতরাচ্ছেন—"ইংরেজ কি ফরাসী তা নিয়ে আমাদের দরকার নেই মাথা ঘামানোর, দরকার হল লোকটিকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া। অসাধারণ শক্তি ওর দেহে। সিংহও নাকি দেদার আছে এ-অরণ্যে, ওরকম একটা লোকের সাহায্য পেলে অনেক সুবিধে হতে পারে।"

"বন্ধু? সাহায্য?"—খেঁকিয়ে উঠল সেই লোকটা, টারজানের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার ব্যাপারে যে এতক্ষণ অগ্রণী ছিল—"বাইরের লোককে কাছে টেনে আনা কি আমাদের পক্ষে নিরাপদ? সোনাদানায় ভরতি ঐ বাইশটা পেটি শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে কী করে নিয়ে তুলব, সেই চিন্তায় যখন মাথা গুলিয়ে যাওয়ার যোগাড় হয়েছে? তুমি কী বল রোহান পাশা?"

রোহান পাশা বলে যাকে সম্বোধন করা হল, সে একটা তামাটে রংয়ের দাড়িওয়ালা লোক, বয়স যার কম-বেশী চল্লিশ বলে এক নজরেই অনুমান হয়। চওড়া কপাল আর খাঁড়ার মত নাক দেখে একদিকে যেমন তাকে বনেদী বংশের লোক বলেই ধারণা করতে ইচ্ছে হবে, কোটরগত চোখ, ভাঙা চিবুক আর ঝোলানো পুরু ঠোঁট দেখলে তেমনি আবার তাকে কুচক্রী চরিত্রহীন শয়তানের পর্যায়ে ফেলবার ঝোঁকও হবে অদম্য। —"আমি কী বলব আর? বেগম যা হুকুম করবেন, আমি তা তামিল করব। এ-অভিযানে ওঁকেই যখন নেত্রী করা হয়েছে, তখন কোন্‌টা দরকার, কোন্‌টা দরকার নয়, সেটা স্থির করার ভার ওঁর উপরে থাকাই ভাল কিন্তু আমি বলছিলাম কী, বেগম সাহেবা, পায়ে যখন রক্ত এখনও ঝরছে, রুমালের ব্যাণ্ডেজটা পালটান। হুকুম হয় যদি, আমার রুমাল দিয়ে আমি নতুন করে বেঁধে দিই—"

বেগম সে-হুকুম দিতেন কিনা, তা আর জানবার উপায় নেই। কারণ সেই মুহূর্তেই একটা বাজ যেন পড়ল অতি নিকটেই কোথাও, খাঁচাটা ঘড়ে উঠল ঝনঝন্ চংচং রবে, আর সেই খাঁচারই

মাথার উপরে লাফিয়ে এসে পড়ল, কোথা থেকে কে জানে, একটা অতিকায় সিংহ।

খাঁচার ভিতরে আবদ্ধ ঐ তিনটি প্রাণীর ভিতরে স্নায়ু তেমন দুর্বল নয় কারোই। দুর্বল হলে সে-কাজে তারা হাত দিত না, যে-কাজের পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই প্লেন ধ্বংস এবং শতাধিক লোকের অপঘাত মৃত্যু। কিন্তু সে-ইতিহাস এখনো বলা হয়নি এই কারণে যে, কাজ হোক বা অকাজ হোক, সেটা ঘটে না গেলে তার কারণ অনুসন্ধানের গরজ আজকাল বড় মহলে কারো বড় একটা দেখাই যায় না। আপাততঃ এইটুকু সবাই শুনে খুশী থাকুন যে, লোক তিনটি, সুন্দরী বেগমসাহেবা সমেত, সবাই একান্ত ডানপিটে বেপরোয়া মানুষ। হৃদয় তাদের, যাকে বলে লোহা দিয়ে গড়া।

সিংহ ডাকল এবং লাফিয়ে এসে পড়ল ঠিক অ্যালুমিনিয়ামের ছাদে। ছাদের খাতব চাদরগুলো দারুণ শক্ত, তাই সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল না পাশা মহাশয়দের মাথার উপরে। ভেঙে পড়ল না, কিন্তু নুয়ে পড়ল বিষম ভারে। পাশা বলে উঠলেন —"বেরাদর হকিম-সাব, ছাদ আর একটু নামলে যে মাথা বাঁচানো দায় হবে।"

সে-কথার জবাব না দিয়ে হকিম-সাব বললেন —"ঐ ন্যাংটো দত্যিটা বলেছিল বটে যে সিংহের উপদ্রব আছে এখানে।"

কোণের দিকে রাইফেল পড়ে আছে দুটো, বেগম সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন—"পাশা আমার পায়ের রক্ত বন্ধ করার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। এইবার সতর্ক হোন, আমার এবং আপনাদের সকলের টুটির রক্ত যেন না ঝরে। ছাদের আস্ত অংশটা নেমে পড়েছে সিংহের ভারে, ওদিকে ভাঙা অংশটা উঁচু হয়ে উঠছে ঢেঁকির যুগুরের মত। রাস্তা তৈরী হচ্ছে পশুরাজের জন্য। ও এখানে ঢুকল বলে।" (ক্রমশঃ)

কলিকাতার রামকৃষ্ণ পল্লী হইতে শ্রীরণধীর দাশগুপ্ত তাঁর স্বর্গতঃ নাতি রজত সেনের (বিচ্ছু) স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁদের প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"রজত সেন স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :

কোন মহাপুরুষের জীবনের একটি অলৌকিক কাহিনী

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ : ৩২শে আষাঢ়, ১৩৮৩। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী আশ্বিন সংখ্যা ১৩৮৩ শুকতারায় প্রকাশিত হবে।

রজত সেন (বিচ্ছু)

আবির্ভাব—৫ই মাঘ, ১৩৭৯
ইংরাজী ১৮ই জানুয়ারী ১৯৭৩ সন।
তিরোধান—৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৮১
ইংরাজী ২৩শে নভেম্বর, ১৯৭৪ সন।

প্রথম পুরস্কার—পনের টাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার—দশ টাকা

"৺শ্রীপদ দে স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

বড় কে ?

সুশীল চক্রবর্তী

হস্তিনাপুর রাজ-অস্ত্র-শিক্ষাকেন্দ্রে বিখ্যাত অস্ত্র-বিশারদ আচার্য দ্রোণ কৌরব-পাণ্ডব-কুমারদের অস্ত্র চালনা শিক্ষা দিচ্ছেন। একাগ্রতা ও সাধনার ফলে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায় সর্বাপেক্ষা পরাদর্শী হয়ে উঠলেন। দ্রোণাচার্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য অর্জুনের অস্ত্রচালনায় তিনি খুব আনন্দিত হলেন। ক্রমে তাঁর বীরত্বের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য শুনতে পেলেন অর্জুনের অস্ত্র চালনার কথা। ব্যাধের পুত্র হওয়াতে তিনি শিশুকাল থেকেই তীর ধনুক চালাতে শিখেছিলেন জন্মসূত্রেই। কিন্তু তীর ধনুক দিয়ে শুধুমাত্র পশু শিকারে তাঁর মন ভরল না। শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত সাহসী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সবরকম অস্ত্রচালনা শিক্ষা করে তিনি একজন বীর যোদ্ধা হবেন, এই ছিল তাঁর আশৈশব স্বপ্ন। কিন্তু এর জন্য দরকার একজন শিক্ষাগুরু। দ্রোণাচার্যের নাম একলব্য শুনেছিলেন ইতিপূর্বেই। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে তিনি একদিন হস্তিনাপুরে দ্রোণাচার্যের কাছে এসে তাঁর মনের কথা জানালেন।

আচার্য দ্রোণ একলব্যের কথা শুনলেন। জানতে চাইলেন তাঁর পিতৃ-পরিচয়। যখন শুনলেন একলব্য ব্যাধ-সন্তান, তিনি ঘৃণাভরে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ, তিনি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বংশজাত ব্যতীত কাউকে অস্ত্র শিক্ষা দেন না, কিংবা শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন না। আচার্য দ্রোণের মতো একজন খ্যাতনামা অস্ত্র-বিশারদ শিক্ষকের এইরূপ উক্তি শুনে একলব্য বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। মুহূর্তের জন্য আচার্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে সংশয় দেখা দিল। যিনি প্রকৃত শ্রেষ্ঠ, তাঁর মনে অহংকার থাকতে পারে না। অহংকার প্রকৃত গুণীকেও নির্গুণে পরিণত করে। শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন হতে গেলে সর্বপ্রথম অহং ভাব পরিত্যাগ করতে হবে। ক্ষণিকের জন্য একলব্যের মনে আচার্যের ব্যবহারে বিরূপতা সৃষ্টি হলেও তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের মনকে শাসন করলেন, সংযত করলেন। কারণ, হস্তিনাপুরে পদার্পণ করবার আগেই তিনি মনে মনে দ্রোণকে তাঁর অস্ত্র-শিক্ষাগুরু রূপে বরণ করে নিয়েছেন। সুতরাং, আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও দ্রোণ তাঁরও আচার্যদেব। এবং গুরুর প্রতি কখনই বিরূপ মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়। একলব্য ক্ষুণ্ণমনে বাড়ি ফিরে এলেন।

দ্রোণাচার্য কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলেও একলব্য কিন্তু হতোদ্যম হলেন না। বরং অস্ত্র-বিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য তাঁর আগ্রহ আরো বহুগুণ বৃদ্ধি হল। তিনি দ্রোণাচার্যের একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করলেন মাটি দিয়ে। তারপর সেই মৃত্তিকা-মূর্তিকে নিকটস্থ একটি বনে স্থাপন করে অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষার সাধনা শুরু করলেন। তিনি ব্যাধের সন্তান হওয়াতে রক্ত-মাংসের গুরু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু মাটির তৈরি গুরু তো আর সেটা করতে পারবেন না! তিনি গুরুর মূর্তিকে প্রত্যহ ভক্তিভরে পুজো করেন, তাঁর সামনে একাত্মচিত্তে ধ্যান করেন, তারপরে একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে শুরু করেন অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা।

একলব্য দ্রোণের মৃত্তিকা-মূর্তি রচনা করে ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ধনুর্ধর হতে পেরেছেন।

যদিও কেউ একলব্যকে প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেননি, কিন্তু তিনি শুধুমাত্র তাঁর অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও ধৈর্যের ফলে ক্রমশঃ সর্বপ্রকার অস্ত্র-চালনায় নিপুণ ও পারদর্শী হয়ে উঠলেন।

একদিন একলব্য তাঁর গুরুর মৃন্ময়-মূর্তির সম্মুখে বসে ধ্যান করছিলেন একমনে। হঠাৎ একটি কুকুরের ক্রমাগত চিৎকারে তাঁর ধ্যানের বিঘ্ন হল। ধ্যানের বিঘ্ন হওয়াতে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে কুকুরটিকে আহত না করেও বাণ মেরে তার মুখ সেলাই করে দিলেন, যাতে সে আর চিৎকার না করতে পারে। তারপরে আবার যথারীতি গুরুর ধ্যানে মগ্ন হলেন।

আচার্য দ্রোণ পঞ্চপাণ্ডবকে নিয়ে শিকারে বেরিয়েছেন। সারমেয়টি ছিল তাঁদের দলভুক্ত। তাকে ঐভাবে ফিরতে দেখে আচার্য দ্রোণ যৎপরোনাস্তি অবাক্ হয়ে গেলেন। এ যে তাঁরও সাধ্যাতীত ব্যাপার! এতদিন অর্জুনের ধারণা ছিল তিনিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ। কিন্তু কুকুরটিকে দেখবার পরে তাঁর সে ধারণা আর রইল না। কারণ, আহত না করেও বাণ মেরে কুকুরের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো শিক্ষা তিনি তখনও লাভ করতে পারেননি। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর চেয়েও বড় ধনুর্ধর আছে এবং অর্জুনের এতদিনের গর্ব নিমেষে অন্তর্হিত হল। দ্রোণাচার্যও মনে মনে বুঝতে পারলেন এই অজ্ঞাত ধনুর্বিদ নিঃসন্দেহে বীরশ্রেষ্ঠ এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য অর্জুন অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী। এমন কি তাঁর চাইতেও কোন অংশে কম বড় ধনুর্বিদ নয়! উপস্থিত সকলেই এই অজ্ঞাত ধনুর্ধরকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে স্থান দিলেন।

যদিও অন্বেষণের ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্রোণাচার্য জানতে পারলেন যে এই অসাধারণ ক্ষমতাশালী অজ্ঞাত ধনুর্বিদ আর কেউ নন, তাঁর কাছে একদা প্রত্যাখ্যাত নিষাদ-রাজকুমার একলব্য। তিনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেও একলব্য তাঁর মৃত্তিকা-মূর্তি রচনা করে স্বীয় ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অদ্বিতীয় ধনুর্ধর হতে পেরেছেন এবং অভূতপূর্ব-ভাবে সারমেয়টিকে হত্যা বা আহত না করেও তার মুখ সেলাই করে দেওয়ার মতো অস্ত্র শিক্ষাও অনায়াসে আয়ত্ত করতে পেরেছে। উভয়েই,

এমনকি উপস্থিত সকলেই বুঝতে পারলেন যে, একলব্য নিজের চেষ্টায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদের আসন অলংকৃত করবার উপযুক্ত এবং অর্জুনের মতো শ্রেষ্ঠ বীরকে যুদ্ধে পরাভূত করা তাঁর পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়। নিষাদকুলে জন্মগ্রহণ করেও তিনি শুধুমাত্র তাঁর নিজের চেষ্টায়, সাধনায় ও একনিষ্ঠতার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সর্বশ্রেষ্ঠ বীরের স্বীকৃতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধুমাত্র এই নয়, ত্যাগেও তিনি ছিলেন মহান। কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার ফলে তিনি যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন, আচার্য দ্রোণের একটি রাজনীতির চালে একলব্য তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি "গুরুদক্ষিণা" দিলেন আচার্যের পদে। এর ফলে ধনুকে তীর সংযোজন করে লক্ষ্যভেদ করবার ক্ষমতা একলব্য চিরদিনের মতো হারালেন। কিন্তু ত্যাগের যে মহান আদর্শ তিনি স্থাপন করলেন, তার কোন তুলনা নেই। সামান্য ব্যাধের সন্তান হয়েও তিনি একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, সাধনা এবং ত্যাগের যে মহান আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন, তাতে তিনি অনেক ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষাও অনেক বেশী সম্মানের আসনে আসীন হয়ে থাকবেন মানুষের মনে চিরকালের উদাহরণ স্বরূপ চির-জাগরূক হয়ে।

বিড়াল তপস্বী

রিপ্লে থেকে

জোচ্চররা যদি সাধুতার ভান করে তাকে বলে বিড়াল তপস্বী। কথাটার উৎপত্তি হয়েছিল বিড়ালের স্বাভাবিক বিশ্বাসঘাতকার প্রবণতা থেকে। তাই বোধ হয় বিড়ালকে সত্যিকারের ধার্মিক করে তোলবার জন্যে এক মহিলার মনে সদিচ্ছার উদ্ভব হয়। মহিলাটি ছিলেন বিধবা আর তাঁর ধনদৌলতও ছিল প্রচুর। তিনি বাস করতেন ইজিপ্টের আলেকজান্দ্রিয়া নগরে। তিনি মারা যাবার পর দেখা গেল তিনি একটা উইল রেখে গেছেন। সেই উইলে তিনি তাঁর যাবতীয় ধনদৌলত বিড়ালদের ধর্মভাব জাগিয়ে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে দেবার জন্য দান করে গেছেন। তাঁর উইলে লেখা ছিল প্রতি বছর বাহান্নটি বেড়ালকে পবিত্র শহর মক্কায় পুণ্যার্জন করার জন্যে নিয়ে যেতে হবে। যে তীর্থ পরিদর্শন করে এলে মুসলমানদের পুণ্য হয় সেখানে গেলে বেড়ালদের কি মানসিক উন্নতি হবে একথা উইলে লেখা ছিল না।

যাহোক উইলের নির্দেশানুযায়ী প্রতি বছরই উটের পিঠে চড়ে বাহান্নটা বিড়াল মক্কাতীর্থ যাত্রা করে। উটের সামনে পথ দেখিয়ে যায় একজন মৌলবী, তাকে বলে বিড়াল বাবা।

তীর্থ করে ফিরে এলে বিড়ালদের বিশেষ পদবী দেওয়া হয়—হাডজী—অর্থাৎ প্রকৃত তীর্থযাত্রী।

"৺শ্রীপদ দে স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

কর্মবীর

পীযূষকান্তি দত্ত

জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে জনৈক শিল্পপতি যখন আত্মচরিতে লিখলেন, "বহুদিন থেকেই মনে মনে সংকল্প ছিল, রাস্তায় চলাচলের জন্য ইঞ্জিন চালিত একরকম গাড়ি বার করব," তখন সত্যিই তাঁর কারখানার এক প্রান্ত দিয়ে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল প্রবেশ করছে, আর পরবর্তী প্রতি ছ-সাত সেকেণ্ডে অপর প্রান্ত দিয়ে একখানি করে সর্বাঙ্গসুন্দর নতুন মোটরগাড়ি বেরিয়ে আসছে। পৃথিবীর ৪৫টি বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের শ্রমের ফসল সেগুলো। আর মাইলের পর মাইল জুড়ে সেই কারখানা। সে দৃশ্য বোধ করি আমাদের কল্পনারও অগোচর!

* * *

উনানে চাপানো রয়েছে চায়ের কেটলি। মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে তার ঢাকনিটা আর ছিদ্রপথে বেরিয়ে আসছে কুণ্ডলিকৃত বাষ্পরাশি। কেন এমন হয়? রান্নাঘরে বসে বসে ভাবে ছোট্ট একটি বালক—আচ্ছা, যদি কোনও পাত্রের সঙ্গে ঢাকনিটা বায়ুনিরুদ্ধভাবে আটকে দিয়ে সবসুদ্ধ উনানে চাপানো যায় তাহলে কেমন হয়? বালকের মাথায় এল পরিকল্পনা।

সেটা রূপায়ণের সুযোগের আশায় থাকে সে। সুযোগ মিলেও যায় একদিন।

রান্নাঘর কর্ত্রীশূন্য, মা অনুপস্থিত। বালক জলপূর্ণ করে একটি মৃৎপাত্র, ছিপির সাহায্যে শক্ত করে এঁটে দেয় তার মুখ। তারপর চাপায় উনানে। সামান্য পরেই টগবগ করে ফুটতে থাকে জল। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করে ফেটে পড়ে পাত্রটা। তার একটা ভগ্নাংশ বিদ্ধ হয় বালকের দেহে আর মুখের খানিকটা ঝলসে যায় উত্তপ্ত বাষ্পে। সেই ক্ষতচিহ্ন চির অঙ্কিত থেকে যায় তার দেহ ও মুখপটে।

এক সম্পন্ন কৃষক গৃহস্থের সন্তান এই অদম্য কৌতূহলী বালক। কৃষি-দেবতার করুণায় সংসারে তাদের কিছুরই অভাব নেই। নেই স্নেহেরও অভাব। পিতামাতার অসীম স্নেহ পুত্ররত্নটির প্রতি। তবুও কেন কে জানে তার বুঝি মন টেঁকে না সংসারে, চাষের ধরাবাঁধা কাজে—যদিও বাবাকে সাহায্য করার কর্তব্যে তার এতটুকু ফাঁকি নেই, বরং কর্মদক্ষতায় যে কোনও সমবয়স্ক বালকের ঈর্ষার পাত্র সে।

আসল ব্যাপার হল এই, সময়-শক্তি-অর্থের অপব্যয়বহুল কৃষিপদ্ধতির সঙ্গে যতই পরিচিত হতে থাকে সে, ততই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ওঠে তার মন। তাই সর্বদাই নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অনুশীলনে মগ্ন থাকে সে। সময় সুযোগ পেলেই খেলাচ্ছলে সংগৃহীত লোহার চাকা, ঘড়ির স্প্রিং, ছুরি করাত, তামার তার, কাচের টুকরো ইত্যাদির সাহায্যে কিছু-না-কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকে। তাই দেখে তার মা বলতেন, বালক নাকি জন্মসূত্রে যন্ত্রকুশল। কে জানত, কতদূর সত্যি ছিল সে কথা।

মাত্র বারো বছর বয়সে এই মাকে হারায় বালক। আর ষোলো বছরে ছাত্রজীবনে ছেদ টেনে দিয়ে ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে পা দেয় পথে। বাবা ও অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীদের শত উপদেশ-

অনুরোধ অগ্রাহ্য করতেও পিছপা হয় না, অথচ হাতে নেই কপর্দকমাত্র। কিন্তু বুকভরা আছে আত্মবিশ্বাস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আর দেহে আছে অফুরন্ত কর্মশক্তি। সেই তার যা-কিছু পাথেয়।

শিল্পনগরী ডেট্রয় জননীর কোলে আশ্রয় পায় মাতৃহারা কিশোর, জীবিকাবৃত্তিও খুঁজে পেতে দেরি হয় না!

জেমস ফ্রাওয়ার এণ্ড কোম্পানি একটি ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান। সাপ্তাহিক আড়াই ডলারের শর্তে সেখানে নিযুক্ত হয় নবাগত। মজুরি পরিশ্রমের তুলনায় অতি সামান্য। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? কাজ শেখা আর নানা-বিধ যন্ত্রপাতির পরিচয় লাভের আনন্দেই মশগুল থাকে সে।

সে আনন্দের খোরাক এক সময়ে সেখানে শেষ হয়ে যায়। চঞ্চলমতি কিশোর তখন ড্রাইডক ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানিতে যোগ দেয়।

এইভাবে মধুলোভী মৌমাছি যেমন ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়, সেও তেমনি এক সংস্থা থেকে আরেক সংস্থায় কাজ নিয়ে ভবিষ্যতের পাথেয় সঞ্চয় করতে থাকে।

পনেরো বছর বয়সেই সে হয়ে উঠেছিল ঘড়ির একজন পাকা মিস্ত্রী। তার সেই জ্ঞান ও দক্ষতা একসময়ে খুব কাজে আসে। কারণ সামান্য উন্নত জীবনধারণের জন্য তাকে এক ঘড়ির দোকানে কাজ নিতে হয়। বিনিময়ে সাড়ে তিন ডলার করে সপ্তাহে সে পেতে থাকে। কিন্তু এর জন্য তাকে কম মূল্য দিতে হয় না। দিনে এগারো ঘণ্টাব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর অতিরিক্ত চার ঘণ্টা করে পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু কর্ম যার প্রাণ, কর্ম কি তাকে ভয় দেখাতে পারে?

স্বভাবতঃ সে কাজও দীর্ঘদিন তাকে খুশী রাখতে পারল না। এবার সে ওয়েস্টিং হাউসের কর্মচারী হিসেবে আগের তুলনায় সামান্য বেশী উপার্জন করতে লাগল।

কিন্তু স্থিরতা জিনিসটা যে তার ধাতে নেই! অতএব আবার সে কাজে ইস্তফা দিল। এরপর গ্রামের ছেলে ফিরে এল গ্রামে। সেখানে সে বাবার কৃষিকাজেই মনোনিবেশ করে। নিজের নানা অভিজ্ঞতা সে এবার চাষের যন্ত্রপাতি তৈরী ও মেরামতির কাজে লাগাতে থাকে।

বাবা ছেলের সুমতি দেখে আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু হতাশার কালো মেঘ আবার একটু একটু করে তাঁর মনের আকাশকে ঢেকে ফেলতে থাকে। কারণ যৌবনে উপনীত হয়েও বাল্যকালের মত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সময় কাটাতে থাকে সেদিনের সেই কৌতূহলী বালক।

ইতিমধ্যে যুবকের বিবাহ হয়। কিন্তু সংসারের মায়া কাটাতে আহ্বান আসে আবার। তাতে সাড়া দিয়ে ডেট্রয়ের পথে পুনর্যাত্রা শুরু করেন তিনি। তবে এবার আর একাকী নয়, সস্ত্রীক।

বিজ্ঞানের বিদ্যুৎ নামক শাখাটি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল খুবই কম। সৌভাগ্যক্রমে তার পরিধি বাড়াবার একটা সুবর্ণসুযোগ জুটে গেল। ডেট্রয়ের সুবিখ্যাত এডিসন ইলেকট্রিক কোম্পানিতে তিনি চাকুরি পেলেন, এবং কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণের পক্ষে তাঁর পূর্বলব্ধ ইঞ্জিনীয়ারিং-অভিজ্ঞতা বিশেষ উপযোগী হল। ফলে সাধারণ কর্মচারী থেকে ধীরে ধীরে তিনি চীফ ইঞ্জিনীয়ার পদে উন্নীত হলেন এবং তাঁর পারিশ্রমিক মাসিক ৪৫ ডলার থেকে ১২৫ ডলার পর্যন্ত বেড়ে গেল।

কিন্তু কোম্পানির স্বার্থে কাজ করার অবসরে তিনি বরাবর স্বগৃহে ইঞ্জিন সম্পর্কিত গবেষণাদি চালিয়ে যেতে থাকেন। কারণ তাঁর সকল অভিজ্ঞতা ও অর্থ অর্জনের মূলে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল একটাই—

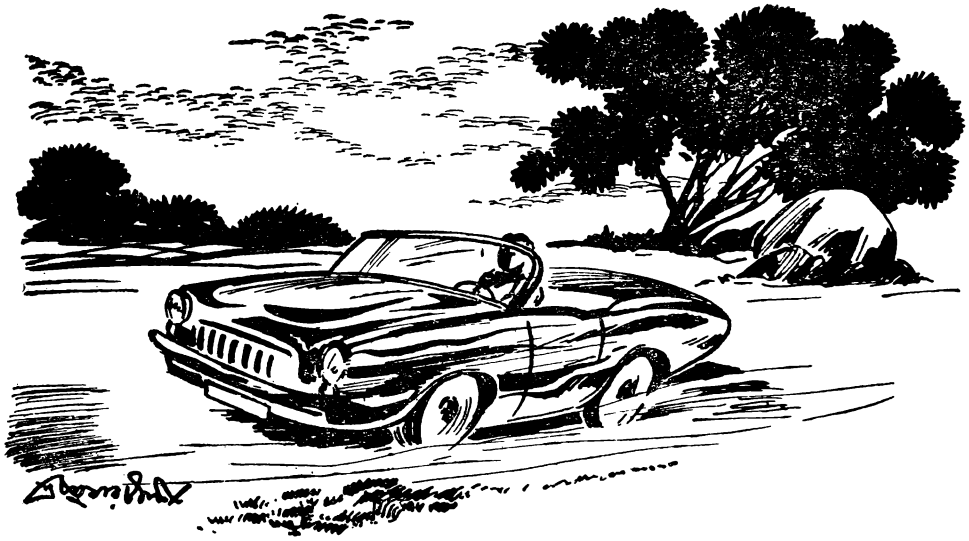

ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে তাঁর প্রথম গ্যাস-মোটর।

স্বল্পমূল্যে মোটরগাড়ি নির্মাণ করে পথের দূরত্ব কমানো।

শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে, তাঁর নানা চিন্তা-ভাবনা, কর্মকাণ্ডের পর যে গাড়ি প্রথম পথে বার হয়, তা হল স্টীম ইঞ্জিন। কিন্তু তার বিপুল ওজনই ছিল প্রধান অন্তরায়। ফলে এর পর তিনি গ্যাস ইঞ্জিন নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন।

সেটা ছিল ১৮৮৫ সাল। একটা অটো ইঞ্জিনের অনুকরণে তিনি একটা গ্যাস ইঞ্জিন তৈরি করে ফেলেন।

তারপর থেকে অহর্নিশ চলতে লাগল নিত্য-নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা—অকূল পাথারে নিরুদ্দেশ যাত্রা। অথচ কারুর সাহায্য বা পরামর্শ পাবার যোটুকু নেই! বরং কেউ কেউ ইতিমধ্যে তাঁকে পাগল ঠাওরাতে শুরু করেছে।

দীর্ঘ দু' বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় এক প্রবল বর্ষণের দিনে ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে পথে ছুটে বেড়াল তাঁর প্রথম গ্যাস-মোটর। বোধহয় সেটাই ছিল তাঁর জীবনের চরম আনন্দের দিন।

তিন বছর ধরে গাড়িটা নানা অভিজ্ঞতার খোরাক যোগাল তার প্রস্তুতকারীকে। অবশ্য সেক্ষেত্রে পদে পদে তাঁকে হতে হয়েছে বাধার সম্মুখীন। কৌতূহলী জনতা-ব্যূহের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালাবার জন্য তাঁকে পুলিসের সাহায্য নিতে হত। এমন কি তাঁর বিরুদ্ধে সেই পুলিসের নানা অভিযোগ এড়াবার জন্য তাঁকে মেয়রের কাছ থেকে এক বিশেষ অনুমতি নিতে হয়েছিল। এমনি আরও কত বাধা।

অবশেষে অর্থের প্রয়োজনে তিনি গাড়িটা ২০০ ডলার দামে বিক্রী করে দেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর দ্বিতীয় গাড়ির কাজ শুরু করেন। গাড়িটার ইঞ্জিন ছিল আগেরটার তুলনায় হালকা। এইভাবে প্রতিটা নতুন গাড়িরই কিছু না কিছু উন্নতি ঘটাতে থাকেন তিনি।

এডিসন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ কিন্তু চীফ ইঞ্জিনীয়ারের এই অদ্ভুত কাজকর্ম দেখে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অপ্রসন্ন হতেন খুব। শেষ পর্যন্ত ১৮৯৯ সালে তাঁরা প্রস্তাব করলেন তিনি জেনারেল সুপারিণ্টেডেণ্টের পদে উন্নীত হবেন,

অবশ্য এই শর্তাধীনে যে তাঁকে মোটরসংক্রান্ত কর্মব্যস্ততা সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে হবে। কিন্তু নিজের লক্ষ্য সম্বন্ধে মনোভাব যাঁর অনমনীয়, শর্তের শৃঙ্খলে কে বেঁধে রাখতে পারে তাঁকে? ফলে প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তা প্রত্যাখ্যান ও পদত্যাগ দুই-ই করে বসলেন।

এরপর অবিলম্বে তিনি কয়েকজন অংশীদারের সহযোগিতায় 'ডেট্রয় অটোমবাইল কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠা করেন। তিন বছরে মোট গাড়ির সংখ্যা দাঁড়ায় ২০টি, এবং যত শীঘ্র সম্ভব সেগুলো বিক্রি হতে থাকে। কিন্তু আদর্শের দ্বন্দ্ব তাঁকে কোম্পানি ছাড়তে বাধ্য করে, কারণ তাঁর মত ছিল জনসাধারণের স্বার্থে গাড়ির দাম যথাসম্ভব কম ধার্য করতে হবে। পক্ষান্তরে অন্যান্য অংশীদারেরা কোম্পানির মুনাফা সর্বাধিক করার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।

১৯০৩ সালের ১৭ই জুন এই শিল্পপতি জগদ্বিখ্যাত ফোর্ড মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেন। ততদিনে তিনি প্রৌঢ়ত্বের পর্যায়ে পৌঁছেছেন।

তরুণ পাঠকেরা, এবার নিশ্চয়ই তোমরা অনুমান করতে পারছ আমি বিশ্বশ্রেষ্ঠ শিল্পপতি হেনরী ফোর্ডের কথাই বলছি।

যাই হোক, প্রথম বছরেই ফোর্ডের কারখানায় ১৭০৮ খানা গাড়ি তৈরি হয়। উৎপাদন আরও বাড়াবার জন্য রাতদিন চেষ্টা চলতে থাকে। ফোর্ড নিজে কঠোর পরিশ্রম করে প্রতিটি গাড়িকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলবার চেষ্টা করতে থাকেন। তবুও ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরবরাহ বাড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফোর্ড গাড়ির এই বিপুল জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল মানব সেবার মহান্ আদর্শ। ক্রেতার স্বার্থের কথা চিন্তা করেই তিনি গাড়ির দাম যথাসম্ভব কম রাখবার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁদের অংশগুলো নিজের ছেলের নামে কিনে নিলেন ফোর্ড। [পৃষ্ঠা ৩১৬

ফলে অসুবিধায় পড়তে হল তাঁকেই। প্রতিশোধ স্পৃহায় সমব্যবসায়ীরা তাঁর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে মোটরগাড়ির পেটেন্ট আইন বলে এক মামলা শুরু করেন, এবং ফোর্ড-গাড়ির ক্রেতাদেরও ভয় দেখান নানাভাবে। বুদ্ধিমান ফোর্ড প্রত্যুত্তরে মামলা চালিয়ে যেতে লাগলেন, আর ক্রেতাদের অভয় দিলেন।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, নিম্ন আদালতে পরাজিত হলেও উচ্চতর আদালতে বিজয়ী হয়েছেন ফোর্ড, আর তাঁর কোম্পানির গাড়ি ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে। তখন তিনি গাড়ি পিছু দাম ১০০ ডলার থেকেও কমিয়ে দিলেন এবং সবশেষে ৭০ ডলার করে ক্রেতাদের ফেরৎ

দিয়ে দিলেন। ব্যবসায় ইতিহাসে এই জনসেবার মনোবৃত্তি অতুলনীয়।

ক্রমে ফোর্ডের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নীতিতে অবিশ্বাসী হয়ে পড়লেন অংশীদারেরা। তখন তাঁদের সংস্রব ত্যাগ করে তাঁদের অংশগুলো নিজের ছেলের নামে কিনে নেন ফোর্ড। এজন্য প্রতি ১০০ ডলার দামের অংশ বাবদ ১২৫০০ ডলার দাম দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। অতঃপর তাঁর একক সু-পরিচালনার গুণে লাভের হার আরও বাড়তে থাকে।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ব্যাপক মন্দা ফোর্ড কোম্পানি দারুণ আঘাত হানল। বাজারে তখন কোম্পানির সাড়ে সাত কোটি ডলার ঋণ। অথচ সম্বল মাত্র নগদ দু' কোটি ডলার এবং ৯৩০০০ মোটর। কিন্তু এই চরম সঙ্কটকালেও সূক্ষ্মবুদ্ধি ফোর্ড কোন সংস্থার কাছে ঋণের দায়ে আত্মসমর্পণ করলেন না। কোন জাদুমন্ত্রবলে সেই সঙ্কট বরং কাটিয়ে উঠলেন।...আজও ফোর্ড প্রতিষ্ঠিত মোটর কোম্পানি বিশ্বের বিস্ময়, সর্ববৃহৎ সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম।

এইভাবে ফোর্ড প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, কর্মনিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস, অন্তর্দৃষ্টি আর সততাই হল মহত্ত্ব অর্জনের সোপান। সমগ্র জগদ্বাসীর কাছে তিনি তাই আজও অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। যদিও তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জন্মেছিলেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই, আমেরিকার মিচিগান প্রদেশের ডিয়ারবর্ণ নামক পল্লীতে।

মজার দেশ

বিশ্বজিৎ পাল

এক যে আছে মজার দেশ সব রকমে ভালো,
দিনে পথে লাইট জ্বলে, রাতের বেলা কালো।

অসৎ লোকে কালো টাকায় করছে বাজি মাৎ
সৎ লোকের কপালেতে আ'ছে জেলের ভাত।

ধর্মের জয় নেইকো সেথায় অধর্মেরই জয়,
সত্যকথা বলতে গেলে সবার লাগে ভয়।

ডাকাত গেলে ডানদিকেতে পুলিস ছোটে বাঁয়,
কেউই সেথায় বিশ্বাসী নয় সবাই ঘুষ খায়।

গঙ্গা সেথায় শুকনো থাকে, রাস্তা জলে ভরে
আধেক লোকের মৃত্যু হয় খানা খন্দে পড়ে।

সবকিছু এর উলটো রকম সব কিছু এর ফাঁকি
ভাবছি এই উলটো দেশ উলটে যাবে নাকি?"

নতুন ধাঁধা

১। প্রথমে দিতে বলি, শেষটা দিই ছাড়ি,
মাথা লেজ কেটে দিয়ে তাকে মেরে ফেলি।
—চন্দনা বিশ্বাস, চেংকুড়ী চা বাগান।

২। দেখলাম তো শ্মশানেতে,
বলছ তবু আছে বনে?
—দেবব্রত রায়, কলিকাতা।

৩। এ দুনিয়ায় বাঁচতে হলে
আমায় ছাড়া চলবে না,
উলটে দিলে হঠাৎ কিন্তু
হেঁয়ালীতে ভুলবে না।
—সুমিতা চক্রবর্তী, গৌহাটী-৮

গত চৈত্র সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। শতদল ২। কেতন ৩। মাবিক

গত চৈত্র সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—দেবাশীষ, ইন্দ্রাণী ও কস্তুরী মহলানবীশ—পঞ্চাননতলা রোড; অনিমা সরকার—পটলডাঙ্গা স্ট্রীট; জ্যোৎস্না, অনু, কমলেশ ও সুকেশ কয়াল—কানাই ধর লেন; অলোকরঞ্জন সরকার—পাটোয়ার বাগান লেন; দেবর্ষি কুণ্ডু—ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট; মহারাজ, মহাবীর, বকাই, কেশিয়ার প্রভৃতি—আর. জি. কর মেন হোস্টেল; বাবা, মা, অলক ও সুমিতা—লেক গার্ডেন্স; নন্দদুলাল, প্রদোষকুমার ও শান্তিময়—প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন; বিশে, বাবলা, শবাই, শম্পা ও পুঁটু—বকুল বাগান রোড; সোনালী, কাকলী ও ইলা বসু—কলিকাতা-৩৪; রাজা, সুভা, ঝিলু বাবুলি প্রভৃতি—চারু অ্যাভেনিউ; সোনালী, শান্তনু, পিয়ালী ও অনির্বাণ—কবীর রোড; দিদিভাই, শিপ্রা, রঞ্জনা ও উত্তম—টালা; ফুলি, বুড়োন, কাজল, মীরা প্রভৃতি—মহাত্মা গান্ধী রোড; সুস্মিতা ও সুদীপ ঘোষ—নাটোর পার্ক; অমল, সমীরণ, সংগীতা ও বাবা—গরচা প্রথম লেন; জবা, ঝুমুর ও নূপুর—মাণিকতলা মেন রোড; অমিত, অতীন ও অজন্তা রায়চৌধুরী—পূর্ব সিঁথি রোড; সোম, রুনি, রুণু, বুবুল প্রভৃতি—নারায়ণ রায় রোড; অজয়দা, শাহজাহান, শান্তিময় ও অনুভা—কলিকাতা-১; শুভ ও বুকুন—পর্ণশ্রী পল্লী; সৌম্য, সুমিত্র, সুধন্য ও কুমকুম মুখোপাধ্যায়—লেক রোড; তুষার, তরুণ, বরুণ ও বিপ্লব—নিমতলা লেন; শ্যামল, তুতু, হনি ও কনি—নিমতলা লেন; কমল ও মীরা সরকার—নিমতলা লেন; টিংকু ভট্টাচার্য—ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট; সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—সেবক বৈদ্য স্ট্রীট; বাবুন, খোকন, বাচ্চু, তোতা, দীপু প্রভৃতি—নেহরু কলোনী; দীনবন্ধু, পদ্মিনী, খুকু, টুকু প্রভৃতি—কলিকাতা-৬০; রবীন্দ্রকুমার ও শৌর্যশেখর দেব—রামকৃষ্ণ ঘোষ রোড; দেবব্রত রায়—কলিকাতা-৭৩; বিশ্বনাথ, শুভ, বিমল, মূর্তি, সরোজ প্রভৃতি—বি. টি. রোড; সৌতম ও পার্থ শীল—সি. আই. টি. রোড।

২৪ পরগনা—সুকান্ত, সুশান্ত, সুপর্ণা ও সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়—কাঁচরাপাড়া; শতাব্দী, মহার্ঘ্য, রবীন ও মাণিক—পানিহাটী; কল্যাণ, কুশল, আশিস, কৌশিক ও শাশ্বতী সিংহ—কামরাবাদ; অমিত, সুমিত, বরুণা ও তথাগত ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; আবীর, কেয়া ও মা—বারাকপুর; মণিকা, রীণা, জয়ন্ত ও কেয়া—ভাটপাড়া; শান্তিময় হাজারী ও অসিতবরণ পাল—আমতলা; তাপসী ভট্টাচার্য—বিজয়নগর; গোপাল, রূপক ও পুষ্পক রায়—বজবজ; কৃষ্ণা, কাবেরী, বাচ্চি ও মিঠু ঘোষ—উদয়রামপুর; মা, দিদি ও অমিতাভ চক্রবর্তী—গোতলাহাট কৃষ্ণপুর; বু, বাবু, মুনমুন, মালা, ঝন্টু প্রভৃতি—ভাটপাড়া।

হাওড়া—সীমান্ত, মুন্টি, দাদু ও ঠাকুমা—হালদারপাড়া লেন; প্রণব, স্বপন, অরবিন্দ, কেশব, প্রশান্ত প্রভৃতি—তেঁতুলকুলী; প্রতাপ লাহা—ইছাপুর; শুভাশিস, দেবাশিস, স্নেহাশিস, মা ও বাবা—কৈলাসচন্দ্র লেন; ইন্দ্রনীল, নভোনীল, বাবা, মা ও পুপু—শিবপুর রোড; বুলা, মুকুল, বাবা ও মা—বলাই মিস্ত্রী লেন; শাওন, অয়ন ও টুম্পা—বালী।

হুগলী—মা, বাপী, পিসীমা, মিতা, ঝুনু প্রভৃতি—চুঁচুড়া ; চন্দন, সুমন, বাপী ও নির্মল দে—খাটুল ; ছন্দা ও সঞ্চিতা বসু—বৈদ্যবাটী ; মিতা, নীতা, কবিতা, সুজাতা ও শিউলী গুপ্ত—বৈদ্যবাটী ; ডেইজি, শ্বেতা, মৈত্রী, টুম্পা ও উত্তম—শ্রীরামপুর ; ত্বিষা, গোপা, কেয়া ও অঞ্জনা—শ্রীরামপুর ; রিঙ্কু, টিঙ্কু, অনল, বাবা ও মা—চুঁচুড়া ; গোবিন্দলাল কুমার, শক্তিপদ সাহা ও পূর্ণচন্দ্র কাঁড়ার—সিঙ্গুর ; চঞ্চল, নন্দিনী, পদ্মিনী, ভানুদা, ডুলু প্রভৃতি—বৈঁচিগ্রাম ; মধু, বেণু, শম্পা, সুতপা ও সুজাতা—চুঁচুড়া ; রুদ্রদেব ভট্টাচার্য—ভদ্রকালী।

বর্ধমান—অপূর্ব, বিশ্বজিৎ, চিন্ময় ও শ্যামলদা—ইছলাবাদ ; সুকুমার ঘোষ ও সলিল বসাক—বানপুর ; শতদল রায় ও কাজল কুশারী—বার্নপুর ; সুমনা, সৌমেন ও মাস্টারমশাই—বর্ধমান ; দেবাশীষ, সুবিনয় ও দেবল—বর্ধমান ; শুভাশীষ, গোপালী, দুলালী, দুলাল প্রভৃতি—বড়বেলুন ; চায়না, সুলেখা, মণি, সীমা ও শীতলমামু—আপার চিলিডাঙ্গা ; কাকু, কাকীমা, মোহন, সুসমন, টুমন ও রিঙ্কু—আপার চিলিডাঙ্গা ; মা, বাবা, নীলাঞ্জন ও তথাগত মুখোপাধ্যায়—বর্ধমান ; ভবানীদি, পুরবী, তৃপ্তি ও অন্যান্যরা—বার্নপুর ; বু, কচন, ফুচু ও বুঁচু—বড়বেলুন ; লাল্টু, মসি, পিন্টু ও অমিয়—দুর্গাপুর ; দিদা, বাবা, মামা, স্বরাজদা ও বাপন—বার্নপুর ; বাপী, রীতা ও ঝর্ণা চৌধুরী—দুর্গাপুর-৬ ; সপ্তমী, পার্থ ও চণ্ডীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—অণ্ডাল ; সুধীন ভট্টাচার্য—আসানসোল ; মা, বাবা, যামিনী, সুতপা, ক্ষুদিরাম প্রভৃতি—দুর্গাপুর-৫ ; প্রভাংশু, সুকুমার, দানী, অশোক প্রভৃতি—নুতনগঞ্জ বাজার ; টুম্পা, শিল্পী ও মিষ্টি বসু—বার্নপুর ; কার্তিকচন্দ্র পোড়েল—বানপুর ; মিতু ও টুটু দাস—ডিসেরগড় ; দেবী, নব, নরু ও আবাং ঘটক—দুর্গাপুর-৮ ; পামেলা, কুহু, স্বপ্না, নবনীতা প্রভৃতি—আসানসোল ; বাবা, তৃপ্তি, কুমকুম, রীণা প্রভৃতি—বার্নপুর ; বাবা, মা, শর্মিলা দিদি ও প্রীতম আচার্য—বার্নপুর ; পণ্ডিত, বিকাশ ও প্রণব—দুর্গাপুর-৯ ; রুবি, বাবন, ছোটকু, টেবী ও বাসু—ডিসেরগড় ; রানী, টাপু, অনুশ্রী ও তনুশ্রী ঘোষ—বার্নপুর ; প্রকাশ চক্রবর্তী—বর্ধমান ; চন্দ্রশেখর ঘোষ—বার্নপুর ; ছবি, কালু, লুলু ও ভুলু সেন—চিত্তরঞ্জন ; অমিত ও পল্লি মুখার্জী—বর্ধমান।

নদীয়া—দেবব্রত, ডালিয়া, মহুয়া ও আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগর ; রাণা ও স্বপ্না মুখার্জী—রানাঘাট ; রেখা, সোনা, অধীর, আকুল প্রভৃতি—কৃষ্ণনগর।

মেদিনীপুর—পিকলু, বুবুন, তানিয়া ও ঈশিতা মাহাতো—ঝাড়গ্রাম ; রুকা, বুকা ও টেবু—পিংলা ; রাজা, সাথী, সিকদার, রেবা ও স্বপন মণ্ডল—মাতকাতপুর ; বাবা, মা, বৈদ্যনাথ, বিশু, শম্ভু প্রভৃতি—মেদিনীপুর ; রুবী, মঞ্জুশ্রী, পিউ ও এলসা মিত্র—মেদিনীপুর ; সোমা, গোপু, জগন্নাথ, শান্তি প্রভৃতি—মহিষাদল ; দেবাশিস সেন, মা ও বাবা—হলদিয়া।

বীরভূম—অজিত, গায়ত্রী, বিকাশ, প্রকাশ, বনজা প্রভৃতি—দুবরাজপুর ; বাপী, অনুরাধা, শিখা, সৌমিত্র প্রভৃতি—দুবরাজপুর ; জয়ন্তী, বাসন্তী, আরতি, গোরা প্রভৃতি—মুরারই ; প্রবোধকুমার দত্ত—মুরারই ; সেন্টু, বাসন্তী, চৈতালী ও শ্রাবণী—মুরারই।

কুচবিহার—রিন্টু, দীপু, বুলি ও মুনা—কুচবিহার ; কল্যাণ ও অঞ্জন বোস—কুচবিহার।

পুরুলিয়া—দেবব্রত রায়, মা, বাবা—নীলকুঠীডাঙ্গা ; মানা, পিকা, বাপী, বড়মামা ও তৃপ্তি ঘটক—অলঙ্গিডাঙ্গা ; শীতলপ্রসাদ বটব্যাল—অলঙ্গিডাঙ্গা ; শংকর, তুহিনা, রাজা, বিমল প্রভৃতি—পুরুলিয়া ; গৌতম ব্যানার্জী ও পিতু দত্ত—পাড়িথানা ; বুবু, শম্ভু, অঞ্জু, গৌতম, কপাদি ও রঞ্জিতদা—মধুতটী ; স্মৃতিবিকাশ, জ্ঞানবিকাশ, পূর্ণেন্দুবিকাশ, খুকু প্রভৃতি—মধুতটী ; গৌতমকুমার রায় ও দুর্গাচরণ গুপ্ত—মধুতটী ; গোপাল, চাঁদু, কিশোর, আশীষ প্রভৃতি—মধুতটী ; তাপস, হারাধন, সুকান্ত, মিণ্টু, তপেন্দু প্রভৃতি—মধুতটী ; বাবা, মা, দাদা, দিদি, বৌদি প্রভৃতি—পুরুলিয়া ; নিমাই, কৃপাসিন্ধু, সুধীর, অনিল প্রভৃতি—পুরুলিয়া ; অনু, মিতু, ববি ও টুবলু—সান্তালদি।

বাঁকুড়া—তারাপদ বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; ছোটকাকা, রূপু, টুকু, বোচন, বাচ্চু প্রভৃতি—ভক্তাবাঁধ ; মুকুল, বকুল, অনিন্দিতা, প্রেমসুন্দর ও বিশ্বদেব বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; মা, বাবা, শীতল, সমীর ও মলয় বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; দেবাশীষ, সুজাতা, দেবকল্যাণ, দেবব্রত ও শুক্লা বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; সন্তদাস বটব্যাল—ভক্তাবাঁধ ; কাকু, পিসিমণি, উত্তম, শম্পা, শংকু ও ঝংকু—ভক্তাবাঁধ ; মণি, রীণা, তুতুন ও বিতান সরকার—বেলিয়াতোড় ; প্রবীর, নিমাই, সুবোধ, সুজিত ও কুমুদ—বাঁকুড়া ; তুপু, দীপালি, জ্যোৎস্না, বন্দনা ও বাদল—বিষ্ণুপুর ; শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু, সিতাংশু—মটকবনী ; বামাচরণ, অশোক, অমিয়, বসন প্রভৃতি—মশিয়াড়া ; কৃষ্ণা, টুকু, চায়না, সুবল, আরতি ও কেমু—তিলুড়ী ; বাবা, মা, অসিত, অসীম, বাণী প্রভৃতি—বাঁকুড়া।

জলপাইগুড়ি—চিত্রলেখা, কৃষ্ণা, সুমিতা ও সন্দীপ মুখোপাধ্যায়—আলিপুরদুয়ার ; শেখর, বাদল, অশোক, গোপাল প্রভৃতি—বানারহাট ; খোকন, গোপাল ও অরুণ সেন—নিউ ময়নাগুড়ি ; অপূর্ব সেন—মাল বাজার।

দার্জিলিং—শান্তিরঞ্জন রায় ও দুলাল সুর চৌধুরী—শিলিগুড়ি ; রীতা, রুমি, বাপ্পা, দুলুপিসি, বাচ্চুপিসি প্রভৃতি—শিলিগুড়ি ; কৌশিক ও সুজাতাদি—শিলিগুড়ি ; মৈত্রেয়ী, তাপস ও নিখিল দত্ত—শিলিগুড়ি।

বিহার—মঞ্জু, অঞ্জু ও ইতি চট্টরাজ—জামসেদপুর-৩ ; তনুশ্রী, রুবেন ও বনশ্রী করগুপ্ত—জামসেদপুর-৫ ; বাবা, মা, প্রবীর, প্রণব, হেমন্ত ও হীরেন—পাটনা-১ ; অচিন্ত্য, গণেশ, নমিতা, সাধন প্রভৃতি—গামারিয়া ; নিশীথ, অসিত, তড়িৎ, অমিত, বাবা ও মা—ঘাটশীলা ; শৈলেন, সনৎদা, কঙ্কন ও শিপ্রা রায়—চাঁচ পটারী ; শর্বরী, সর্বাণী, বিনীতা, সুনীতা ও অর্ণব পাণ্ডে—সাকচী ; বাবু, পিণ্টু, বুম্বা ও মৌসুমী চট্টরাজ—জামসেদপুর-৫ ; দেবাশীষ, সুজাতা, দেবকল্যাণ, শুক্লা ও অনুপ বটব্যাল—কাপাসারা ; ঝিন্টু, ঝুমঝুমি, মা ও কাকীমা—পাটনা-৪ ; অসিত, রণজিৎ, রীতা, মা, বাবা ও দিদা—কুমারডুবি ; মা-মণি, সুমিত, বাবলা ও গুড্ডু—বোকারো স্টীল সিটি ; বৃষ্টি ও রণো—রাঁচী।

আসাম—জীবনময়, ঋক্তি, সব্যসাচী ও সন্ধ্যা—তিনসুকিয়া ; সোমা, রুমা, বাসু, পম্পা, গৌতম ও কুটুপিসি—মিলনপুর ; সুব্রত, শুভ্রা ও দেবব্রত মিত্র—ডিব্রুগড় ; জেঠু, বাবা, অমলদা, সন্দীপ ও চয়ন সিংহ—ডিব্রুগড় ; বীণা, বিমল, কমল, গীতা প্রভৃতি—ডিব্রুগড় ; সঞ্চিতা, সুদীপ্তা, ত্রিদিব, মান্ত ও উমা দে—ডিব্রুগড় ; দীপ্তিকুমার, গীতাঞ্জলি, দেবপ্রিয় ও পত্রালী বিশ্বাস—ডিব্রুগড় ; দিদিভাই, রেবা, মীনাক্ষী, সন্ধ্যা ও সুতপা চক্রবর্তী—ডিব্রুগড়।

উত্তরপ্রদেশ—বিশ্বজিৎ, সরস্বতী, শান্তা, ভাস্কর প্রভৃতি—গণেশ মহল্লা।

দিল্লী—মিষ্টি, টোটন, খোকন ও লোটনমামা—নিউ দিল্লী ; মুন্না ও মানিয়া—নিউ দিল্লী-২১ ; সুনীল, পুষ্পেন, রথীন ও দ্বিজপদ—নিউদিল্লী-১৬ ; পারমিতা ঘোষ—নিউ দিল্লী-১৬ ; রণজিৎ সিংহ—নিউ দিল্লী-৩।

মধ্যপ্রদেশ—গোপাল, খোকন, রীণা ও খোকা—বিলাসপুর।

ত্রিপুরা—টিয়া, রিন্টি, বান্টি, টুনকু, টুনটুন প্রভৃতি—আগরতলা।

ছোট ছোট বাসন কোসন
চামচ হাঁড়ি-কুড়ি
'ডাটার' গুঁড়ো মশলা দিয়ে
রান্না ভালই করি।
ডাটা
গুঁড়া মশলা
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ

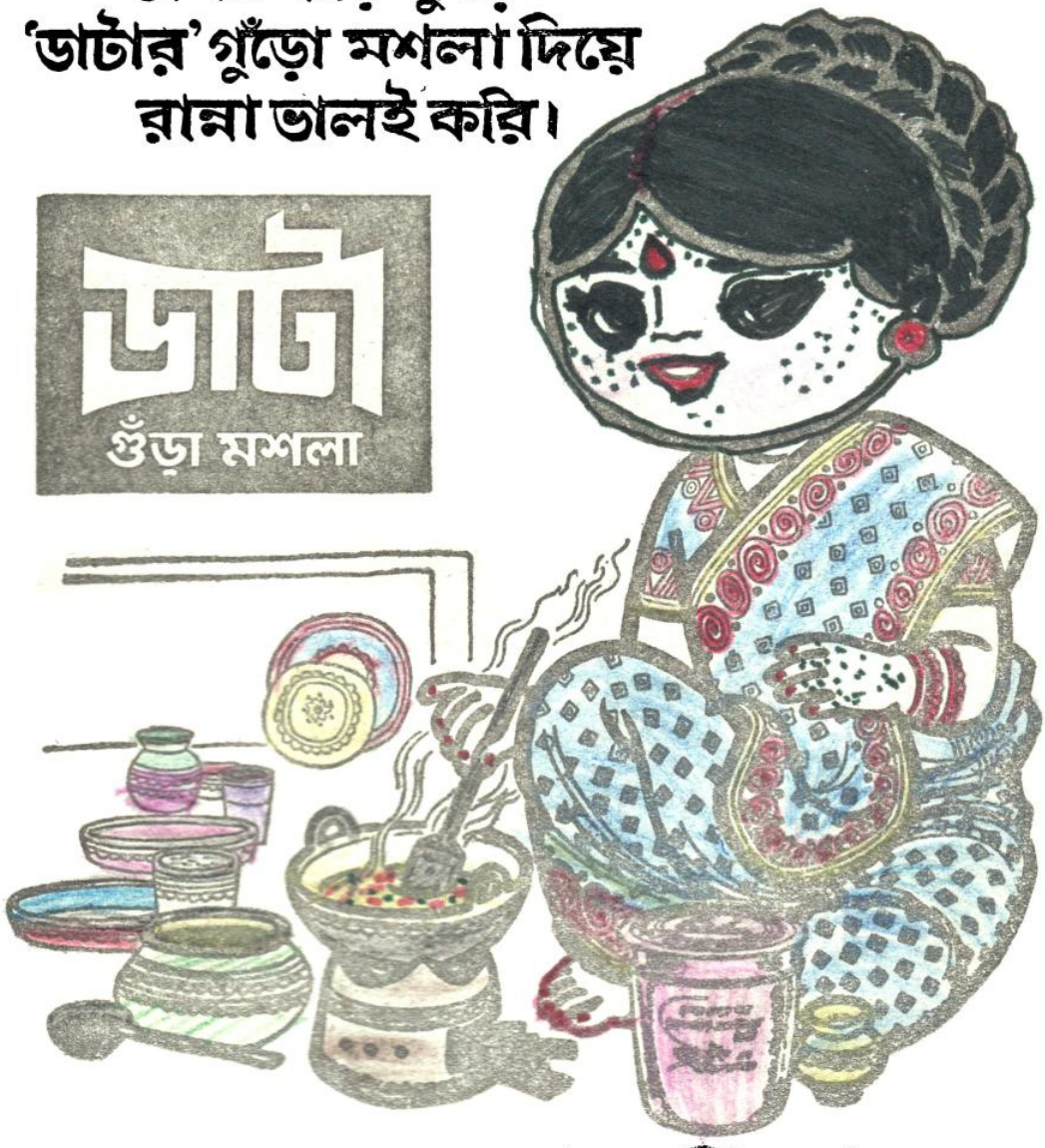

দার্জিলিঙে
সর্বাধুনিক আকর্ষণ
প্রমেচয়েল ইউথ হোস্টেল

ইউথ হোস্টেল। ম্যালের খুব কাছে চমৎকার পরিবেশে।

TRAVELTIPS

বাজারের সেরা অভিধান—

সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত

Century Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 20·00

Century Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs. 20·00

ডাকমাসুল সহ টা. ২৪·০০ স্থলে মাত্র টা. ২০·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Pocket Dictionary (ENG.-BENG.)
Pocket Dictionary (BENG.-ENG.)
শীঘ্রই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে

NEW BENGAL PRESS (Private) Ltd., 68, College Street, Calcutta-12

সেরা Note বলতে ●A. T. DEV● এর Note ই বুঝায়

NOTES FOR 1978 | S. F. NOTES FOR 1978

NOTES ON
পাঠ সংকলন (প্রথম খণ্ড)
(গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ)
(IX & X) **দাম—টা. ১০·০০**

NOTES ON
Selections From
English Prose (IX & X)
Price—Rs. 10·00

NOTES ON
Selections From
English Verse (IX & X)
Price—Rs. 6·00

A. T. D E V

NOTES ON
সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহ
(গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ)
Class IX দাম—টা. ৫·০০

NOTES ON
সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহ
(গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ)
Class X দাম—টা. ৮·০০

NOTES ON (Pre-University)—
English Prose Rs. 2·50
English Poetry Rs. 3·50
Bengali Rs. 4·00

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড—২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

শব্দবোধ অভিধান

বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় অভিধান

একখানি অভিধানে চরিতাবলী, বিবিধ জ্ঞাতব্য, ইয়ার বুক ও সাইক্লোপিডিয়ার প্রয়োজন মিটবে

এতে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বিবরণ, বাঙ্গালা বানানের নিয়ম, বাঙ্গালা ধাতু প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠার উপর এই বই আপনার একটি সম্পদ।

মূল্য চল্লিশ টাকা

চল্লিশ টাকা পাঠালে রেজিস্টারি করে বই পাঠানো হবে।

দেব সাহিত্য কুটীর

২১, ঝামাপুকুর লেন • কলিকাতা ৯

Regd. No. W. B./E. C.—60

"Suktara"

ছোটদের বুক অব নলেজ

দেব সাহিত্য কুটীরের ছোট ও বড়দের জন্য বিশেষ ভাবে লেখা
এনসাইক্লোপীডিয়া পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়ে
তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রায় ৫০ খানা রঙিন ছবি।
প্রতি পাতায় ছবি

ছোটদের বুক অব নলেজ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্বকোষ। দীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, অধ্যাপক ও পণ্ডিতদের সহযোগিতায় এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। নিজের ঘরে এবং লাইব্রেরীতে রাখার মত বই।
এই বই কাছে থাকা মানে সব প্রশ্নের উত্তর মেলা।
৫০ টাকা পাঠালে রেজেষ্টারী করে পাঠান হয়।